# সঙ্গীত জগতের বিশাল পরিবর্তন এসেছে, গান এখন অন্তরালে

হাসান মতিউর রহমান

নেপথ্যের মানুষ তিনি। অন্যকে তারকা বানিয়ে নিজে থেকেছেন প্রচারবিমুখ। গানকে পুঁজি করে ভালো থাকা যায় এবং অন্যকেও ভালো রাখা যায়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গীতিকার, সুরকার, শিল্পী হাসান মতিউর রহমান।

১৯৭৫ সালের কথা। ঢাকায় এসেছিলেন ডিগ্রি পড়তে। পুঁজি, মায়ের দেয়া এক হাজার টাকা, যা বাবার তহবিল থেকে নেয়া। সেই টাকায় নারায়ণগঞ্জ থেকে কাপড় এনে ঢাকার ফুটপাতে বিক্রি। এরপর দিনে কাজ করেছেন সাবান ফ্যাক্টরিতে, কলেজে পড়েছেন নাইট শিফটে। ব্যাংকেও চাকরি করলেন। তবে একে একে সবই ছাড়তে হলো, শুধু ছাড়তে পারেননি গানের ভুবন।

আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার

গান ভাবনায় যেন রীতিমতো একজন উন্মাদ মানুষ।

আশির দশকে হিন্দি আর উর্দু গজলের ঢেউয়ে বড় হোঁচট খায় এদেশের বাংলা গান। ভারতীয় মৌলিক গানে বাজার যখন সয়লাব, তখনই বাংলা গান (বিশেষত লোকগান) রক্ষায় আন্দোলনে নামেন কেউ কেউ। এদেরই অগ্রভাগে ছিলেন হাসান মতিউর রহমান।

ওই আন্দোলনকে কৌশলী ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে তিনি বলছিলেন, এটি করতে না পারলে বাংলা লোকগানের এমন বিস্তৃতি ঘটত না।

তার হাতেই মাইক্রোফোনে প্রথম ফুঁ দেয়া দিলরুবা খান, মুজিব পরদেশী, আশরাফ উদাস, মনির খানের মতো বিখ্যাত সংগীত তারকাদের। ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজের সংগীত জীবনের জনপ্রিয়তার নেপথ্যের কারিগরও তিনি। তার লেখা গানে মাত করেছেন রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোররাও।

যাতে স্বপ্ন দেখেছেন তাতেই সফল হয়েছেন। টানা বিশ বছর বাংলাদেশ ক্যাসেট সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ফরমায়েশি গানে তার জুরি নেই। তিন সহস্রাধিক গান লিখে করেছেন সফল ব্যবসাও। লিখছেন এখনও। সংগীত জীবনের আত্মকথা খোলামেলাভাবে তুলে ধরেছেন জীবনঘন সাক্ষাৎকারে। আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গ্রন্থনা করেছেন **সায়েম সাবু**

**সায়েম সাবু :** স্কুলে পুঁথি পড়েছিলেন। তা-ও আবার নিজের রচনা। কোন সময়ের ঘটনা?

**হাসান মতিউর রহমান :** এটি হাইস্কুলের ঘটনা। প্রাইমারি পাস করে সবে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার ইব্রাহিমপুর ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে হাইস্কুলে যেতাম।

অনেক নামকরা স্কুল ছিল। প্রতি বছর নজরুল আর রবীন্দ্রজয়ন্তী খুব ঘটা করে পালিত হতো। তবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর চেয়ে নজরুলজয়ন্তী বড় করে আয়োজন করা হতো। জয়ন্তী শুরুর এক মাস আগে থেকেই রিহার্সেল

শুরু হয়ে যেত। সুবোধ স্যার অনেক ভালো হারমোনিয়াম বাজাতেন। তিনিই নির্ধারণ করে দিতেন কে কোন গান গাইবে। রিহার্সেলের কি যে আনন্দ ছিল! কেউ কবিতা, কেউ গল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আমি গানেই থাকতাম।

একবার মনে হলো সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যতিক্রম কিছু করা দরকার। সব সময় সোজা চিন্তা করে জীবন চলে না। মাঝে মাঝে বাঁকা চিন্তা করতে হয়। ভাবলাম, নজরুল ইসলামের জীবনী নিয়ে পুঁথি লেখা যায় কি না। শুরু করলাম। লিখে ফেললাম।

যথারীতি রিহার্সেলে চলে গেলাম। স্যাররা তো শুনে অবাক। বললেন, নজরুলের জীবনী নিয়ে এভাবে তো কোনো রচনা হয়নি। ফাইনালে আমার নাম চলে গেল।

**সাবু :** তখন আপনি কোন ক্লাসে?

**মতিউর :** তখন আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

**সাবু :** এই প্রতিভা কাকে অনুসরণ করে?

**মতিউর :** ছোটবেলা থেকেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পড়ার অভ্যাস ছিল। আমার গানের প্রতিভা এখান থেকেই সৃষ্টি হতে থাকে। আমি দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ যদি কবিতা লিখে এত বড় কবি হতে পারেন, তাহলে আমিও তো গান লেখার চেষ্টা করতে পারি। ছোটবেলায় বিখ্যাত মানুষের জীবনী পড়ে আমার মনের দুয়ার খুলেছি। তাই আমি মনে করি, সবারই বিখ্যাত জনের জীবনী পড়া উচিত। অন্যের সফল জীবন জানতে পারলে নিজের মধ্যে স্বপ্ন জাগে। লালন সাঁই, হাছন রাজার জীবনী পড়লে কেউ থেমে থাকতে পারে না। ভিন্ন কিছু করার স্বপ্ন দেখবেই।

**সাবু :** বিশেষ কোনো ব্যক্তি এই স্বপ্নে ভর করেছিল কি না?

**মতিউর :** সৃজনশীল সবার কাছ থেকেই কিছু নিতে পারাটা হচ্ছে সার্থকতা। তবে আমি লালনকে নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলাম। ছোটবেলাতেই লালনের গান শুনতাম আর ভাবতাম, একজন মানুষ শিক্ষা নেননি, কোনো দিন স্কুলে যাননি, সেই মানুষটি কীভাবে এমন গান লিখতে পারে। এটি আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিত।

লালন তার গানের জগৎ সৃষ্টি করেছেন মানুষের কাছ থেকে। সিরাজ সাঁইদের মতো গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গ পেয়ে লালন তার এই অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। লালনকে নিয়ে লেখা প্রায় সবই পড়েছি। সর্বশেষ তার জীবনী পড়ে মনে হয়েছে, তিনি মহাসাগরের মানুষ, অথচ আমরা তাকে পুকুরে রেখে মূল্যায়ন করছি। তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় অন্তর আলোকিত করেছিলেন। অন্তর্তত্ত্ব জানতে পারলে তার অন্য কোনো শিক্ষার আর দরকার পড়ে না।

**সাবু :** পুঁথি পড়ার কী হলো?

**মতিউর :** নজরুলের জন্মদিনে স্কুলে বিশাল আয়োজন। অন্যের কাছ থেকে একটি পাজামা-পাঞ্জাবি চেয়ে নিয়ে পরলাম। তখন লুঙ্গি আর শার্ট পরে স্কুলে যেতাম। প্যান্ট পরেছি আমি ম্যাট্রিক পাস করার পর।

১১ জ্যৈষ্ঠ নজরুলের জন্মদিন। সকালেই স্কুলে গেলাম। স্কুলের মাঠ দর্শকে ভরে গেছে। অনুষ্ঠান চলার একপর্যায়ে আমার নাম ঘোষণা করা হলো। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মঞ্চে উঠেই মাইকে জোরে একটি ফুঁ দিলাম। জড়তা কেটে গেল। প্রায় ১০ মিনিট সময় নিয়ে পুঁথি পড়লাম। শেষ করার পর প্রধান শিক্ষক মজিদ স্যার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, শাবাশ বেটা। ফাটিয়ে দিলি। স্যার বললেন, যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবি। স্যারদের সবাই বাহবা জানিয়ে দোয়া করতে থাকলেন।

বলা যায়, এরপর থেকেই স্কুলে আমি 'হিরো'। গান, কবিতা সব ম্লান হয়ে গেল। স্কুলের বন্ধুরা, ছোট-বড় সবাই বলতে শুরু করল, ভাই এই পুঁথি লেখলেন ক্যামনে। স্কুলের অনেকের কাছেই আমি তখন গুরু। এর কারণ হচ্ছে গান, কবিতা, গল্প সবাই বলতে পারছে। কিন্তু নিজের লেখা পুঁথি এই প্রথম মঞ্চে পরিবেশিত হলো। এটি গোটা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা এনে দেয়।

এরপর থেকে যেকোনো অনুষ্ঠানে আমার নাম আগে ডাকা হতো। স্কুলে আমার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এখনও গান লিখে মজা পাই, আনন্দ পাই। কিন্তু ওই সময়ের আনন্দ আর এখনকার আনন্দের ভিন্নতা রয়েছে।

**সাবু :** আজকের এই অবস্থানে আসার জন্য সেদিনের পুঁথি পড়ার ঘটনাও বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগায়?

**মতিউর :** অবশ্যই। জনপ্রিয়তার কি মর্ম, তা ওইদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, যা পরবর্তিতে গান লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজে দেয়।

**সাবু :** জন্ম, গ্রাম?

**মতিউর :** আমি ঢাকা জেলারই বাসিন্দা। দোহারের নয়াবাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব ধোয়াইর গ্রামে আমার জন্ম। আমি নানার বাড়িতে জন্ম নিই। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল উদ্দিন স্যার জন্ম তারিখ লিখে দিয়েছিলেন ১৯৫৫ সালের ৮ ডিসেম্বর। সত্যিকার জন্ম তারিখের সঙ্গে দুই-এক বছর হেরফের হতে পারে আর কি। আমাদের বাড়ি থেকে নানার বাড়ি মাইল খানিক দূরত্ব ছিল।

**সাবু :** বাবা কি করতেন?

**মতিউর :** বাবা গ্রামের আর দশ জন মানুষের মতোই সহজ-সরল ছিলেন। পড়ালেখা জানতেন না। শুধু নামটা কোনো মতে স্বাক্ষর করতে পারতেন। ব্রিটিশ আমলের কথা। বাবা থাকতেন কলকাতায়। কলকাতার কাহরাপাড়া নামক জায়গায় আমাদের এলাকার অনেকেই থাকতেন। ব্রিটিশ আমলে অধিকাংশ লোকেই কলকাতামুখী ছিলেন। কলকাতাই ছিল তখন শিল্পনগরী এবং চাকরির আকর্ষণীয় জায়গা। বাবাও কলকাতায় ছোটখাটো একটি চাকরি করতেন। তবে দেশ ভাগ হওয়ার পর এপারে ফিরে আসেন।

**সাবু :** বাবা দেশে এসে কি চাকরিতে যোগ দিলেন?

**মতিউর :** না। দেশে ফিরে বাবা 'পাকিস্তান বিড়ি' নামে ছোট্ট একটি বিড়ির ফ্যাক্টরি দিলেন। শালপাতা দিয়ে বিড়ি বানানো হতো। গ্রামের লোকজন তখন শালপাতার বিড়ি টানতেন।

বাড়ির বাংলা ঘরেই শ্রমিকরা বিড়ি বানাত। পরে বাবা সেগুলো মোকামে নিয়ে বিক্রি করতেন। খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের ব্যবসা ছিল।

**সাবু :** আপনি ছোটবেলাতেই গান-বাজনায় আসক্ত। বাবা কিছু বলতেন না?

**মতিউর :** বাবাও গান-বাজনার মানুষ ছিলেন। খেলাধুলা আর গান বাজনায় বাবার ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা কাজ করত এটি আমাদের অবাক করেছে। শুনেছি, কলকাতায় চাকরি করে যা আয় করতেন, তার অর্ধেক টাকা ব্যয় করতেন গান-বাজনা আর খেলাধুলায়।

**সাবু :** তিনি নিজে খেলা করতেন?

**মতিউর :** বাবা ছিলেন আনন্দের মানুষ। গ্রামে তখন হাডুডু খেলা জমজমাট অবস্থা। ফুটবল কিছুটা ছিল আর ক্রিকেটের তো নামই শুনিনি। প্রতি গ্রামে তখন হাডুডু খেলার আয়োজন হতো। বাবা নিজেই হাডুডু খেলার টিম রাখতেন। সাত গ্রামের সেরা সেরা খেলোয়াড়দের দ্বারা বাবা টিম সাজাতেন। এটি ছেলে-বাবার নেশা। অনেক অর্থ ব্যয় করে টিম পুষতেন।

কলকাতায় থাকতে তিনি বহু যাত্রাপালা দেখেন। 'গুণাই বিবি' যাত্রাপালা দেখেতে দেখতে তিনি পুরো স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে ফেলেন। বাবা দেশে এসে আমার এক চাচাত বোনের স্বামীর সহায়তায় পুরো যাত্রাপালা লিখে ফেলেন। বাবা ধারাবাহিকভাবে বলতেন, দুলাভাই লিখতেন। পরে গ্রামের উৎসাহী লোকদের দিয়ে যাত্রাপালার টিম করা হয় এবং যাত্রা মঞ্চস্থ করা হয়।

**সাবু :** তখন আপনার বয়স কত?

**মতিউর :** টু কিংবা থ্রির ছাত্র হয়ত। বাবার সেই দিনকার কথাগুলো কোনো মতে মনে পড়ে। মঞ্চের পাশে বসে বাবা ডিরেকশন দিতেন আর দুলাভাই (বই মাস্টার) পালা পড়তেন।

বই মাস্টার মঞ্চের কাছে বসে বসে পড়ে শোনাতেন আর অভিনেতারা তাই বলে অভিনয় করতেন। ছোটবেলার সেই ঘটনা আজও আনন্দ দেয়। শৈশবে অনেক যাত্রা দেখেছি। বিশেষ করে শহীদ কারবালা, রূপবান, আলোমতি প্রেম কুমার, অরুণ কুমার, গুনাইবিবির কথা আজও ভুলতে পারি না।

**সাবু :** একেবারে মঞ্চের আনন্দ! শৈশবে এমন আনন্দ আপনার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব ফেলার কথা।

**মতিউর :** আহ! সে আনন্দ বর্ণনা করার মতো নয়। টেলিভিশন, রেডিওতে শোনা এক একরকম আর সরাসরি মঞ্চের পাশে বসে দেখা আনন্দ অন্যরকম। শৈশবের এসব ঘটনা আমাকে গানের দলে নিতে উৎসাহ জোগায়।

**সাবু :** শৈশবেই গানে প্রবেশ করছেন। বাবা বাধা দেননি?

**মতিউর :** না। বাবা খোলা মনের মানুষ ছিলেন। আমি পড়ালেখায় খুব

মনোযোগী ছিলাম বিষয়টি, তা নয়। কিন্তু ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমি প্রথম ছিলাম। এ কারণে পড়ালেখা নিয়ে আমাকে বকুনি খেতে হয়নি। বৈঠকি, যাত্রাপালা, বিচার গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু বাবা-মা দেখতেন, আমি পরীক্ষায় প্রথম হচ্ছি। এ কারণে বাবা-মা আমার পড়ালেখা নিয়ে কোনো চিন্তা করতেন না। পড়ালেখার চেয়ে আমি গানেই বেশি মনোযোগী ছিলাম।

**সাবু :** গানের মঞ্চে উঠছেন। পড়ালেখাতেও ভালো। কোনোটায় ছেদ ঘটল না?

**মতিউর :** না। দুটির একটিতেও ব্যত্যয় ঘটেনি। কারণ আমি জানতাম, পাস করব এবং রেজাল্ট ভালোই হবে। এ কারণে পড়ালেখা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম না।

পড়ালেখার পাশাপাশি আমি গানে তখন রীতিমতো আসক্ত হচ্ছি। ১৯৬৫ সালের দিকে বাবা একটি রেডিও কিনেছিলেন। আমি সেই রেডিওর গন্ধ আজও ভুলতে পারি না। মনে আছে, বাবা যখন একটি বাক্স থেকে রেডিওটি বের করল, তখন মনে হলো ম ম গন্ধ বের হচ্ছে। গ্রামে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। মনে হলো, আমরা জমিদার হয়ে গেছি। থ্রি ব্যান্ডের নীল রঙের রেডিওটি বাবা ঢাকা থেকে কিনেছিলেন।

ওই সময় রেডিওতে আব্দুল আলীম, ফেরদৌসী রহমান, আব্বাস উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, মাহমুদুন নবী, আব্দুল জব্বার, খন্দকার ফারুখ আহমেদ, আনোয়ার উদ্দিনের গান শুনে মনের ভেতর ভীষণ অস্থিরতা কাজ করত। ওই সময়ের গান শোনার আনন্দ জীবনে আর কখনও আসবে না। কোথাও টেলিভিশন ছিল না। সন্ধ্যায় রেডিও শোনার জন্য পাড়ার শতেক মানুষ জড়ো হয়ে যেত।

**সাবু :** বলছিলেন, বাবার যাত্রাপালার কথা। অভিনয় করত কারা?

**মতিউর :** গ্রামের লোকজনই অভিনয় করতেন। তাদের কেউ কৃষক, কেউ কাপড়ের ব্যবসায়ী আবার কেউ তাঁতি ছিলেন। সবার মধ্যেই আন্তরিকতা ছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই রিহার্সেল চলত। পুরুষই নারী সেজে অভিনয় করত। তাদের অনেকেই মারা গেছেন, কেউ কেউ বেঁচে আছেন। মনে আছে, গুনাই বিবির অভিনয় করেছিলেন আরশাদ আলী নামের একজন। আর তোতা মিয়ার অভিনয় করতেন রজ্জব আলী। আরশাদ আলী এমনভাবে মেয়ে সাজতেন যে তার বাড়ির লোকও চিনতে পারত না।

মনে আছে, দূর থেকে অনেকেই যাত্রা দেখতে এসে আমার বাবার কাছে এমনও প্রস্তাব দিয়েছেন যে, গুনাই বিবিকে বিয়ে দিলে দশ বিঘা জমি লিখে দেয়া হবে। বাবা হাসতেন। অনেক ঘটনাই ঘটত। গ্রামে এসব নিয়ে ব্যাপক আনন্দও হতো।

**সাবু :** পুরুষকে নারী সাজিয়ে অভিনয় করানো। এসবে সামাজিক প্রতিকূলতা ছিল না?

**মতিউর :** না। আমাদের গ্রামে এমন কোনো গোঁড়ামি ছিল না। গ্রামে অনেক হিন্দু বাস করত। আমরা ওদের পূজায় যেতাম। ঈদে হিন্দুরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসত। সবার মধ্যেই সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ছিল। হিংসা ছিল না। দেখেছি, অনেক হিন্দু মসজিদের ইমামের কাছ থেকে পানি পড়া নিয়ে গেছেন। তখন ছিল বিশ্বাসের সম্পর্ক। এখন আপনি তা দেখতে পাবেন না। সময় সভ্য হচ্ছে, কিন্তু মানুষ অসভ্য হচ্ছে।

**সাবু :** বাবার এই হেয়ালিপনা মা কীভাবে দেখতেন?

**মতিউর :** মায়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। মা থেকে আমি ১৪ বছরের ছোট। মা কোনো বকুনি দিতে গিয়ে বলতেন, তুমি শিক্ষিত হতে পারো, অনেক কিছু জানতে পারো, কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবা, তুমি আমার চেয়ে ১৪ বছরের ছোট।

আমি বাবা-মায়ের মধ্যে কোনো দিন ঝগড়া করতে দেখিনি। আমার মনে হয়েছে, মা অথবা বাবা কিংবা উভয়ে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে চলতেন। এরপরও আমার মনে হয়েছে, বাবা মাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। শুনেছি, বাবার পছন্দে পরিবার বিয়ে দিয়েছিলেন। মা দেখতে অনেক সুন্দরী ছিলেন। আমার নানিও অনেক সুন্দরী ছিলেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে মা ছিলেন সবার ছোট।

এ কারণে বাবাকে আমার মায়ের পক্ষের আত্মীয়স্বজন অনেক ভালোবাসতেন। মামা, খালুরা বাবাকে অনেক বিশ্বাস করতেন, ভরসা পেতেন। আমার বাবা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কোনো দিন অন্যের ক্ষতি করতে পারেন, তা কল্পনাও করা যেত না। বাবা ছিলেন একেবারে সহজ-সরল। বাবাকে নিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করতেই পারি। বাবার আচরণে বা কথায় গ্রামের কেউ কষ্ট পেয়েছেন, এমন নজির কেউ দেখাতে পারবেন না।

**সাবু :** বাবারা কয় ভাই ছিলেন?

**মতিউর :** বাবারা ছিলেন দুই ভাই। বাবার নাম ছিল হাসান উদ্দিন। আর চাচার নাম ছিল হোসেন উদ্দিন।

আমার সার্টিফিকেট নাম ছিল শেখ মুহাম্মদ মতিউর রহমান। পরে নাম পরিবর্তন করে হাসান মতিউর রাখা হয়েছে।

**সাবু :** নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট কী?

**মতিউর :** আমি যখন রেডিওতে গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হই তখন নামটির পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করলাম। অনেক চিন্তাভাবনা করে বাবার নামের একাংশ আমার নামের আগে সংযুক্ত করে হাসান মতিউর রহমান নির্ধারণ করলাম। রেডিওতে আমার লেখা গান হাজার হাজারবার প্রচারিত হয়েছে। বাবা যতবার আমার গান শুনেছেন, ততবার চোখের পানি ছেড়েছেন। এটি ছিল বাবার আনন্দ অশ্রু।

**সাবু :** আপনারা কয় ভাইবোন?

**মতিউর :** আমরা চার ভাই, তিন বোন। আমি সবার বড়। আমার পরের ভাই মজিবুর রহমান। গ্রামে থেকেই ব্যবসা করছেন। তার ছোট বোন। অনেক আগেই বিয়ে হয়। এরপরের ভাই দেশের বাইরে ছিলেন। এখন দেশেই থাকেন। পরের ভাই বাহরাইন থাকেন। সবার ছোট বোন মনোয়ারা বেগম অস্ট্রিয়ায় থাকেন।

**সাবু :** শৈশব স্মৃতি নিয়ে কী বলবেন?

**মতিউর :** পদ্মার তীর ঘেঁষে আমাদের বাড়ি। আগে নদী একটু দূরে ছিল। এখন এক্কেবারে কাছাকাছি। পাখিডাকা ভোর আর ঘুঘুডাকা দুপুর দিয়েই তো গ্রামের শৈশব শুরু হয়। আমার বেলাতেও তাই ছিল। রাখালের বাঁশির সুর, মাঝিদের ভাটিয়ালি আর মানুষের মুখে মুখে জারি-সারি-পল্লীগীতি-মুর্শিদী-বিচার গান, যাত্রা গান, কৃষ্ণলীলা, গাজীর গীত দিয়ে আমার শৈশব পূর্ণতা পেয়েছে। বলতে পারেন আমার বুদ্ধির পত্তন হয় এসব গানের মধ্য দিয়ে। পড়াশোনার চেয়ে গানে অধিক মন ছিল। শৈশবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনে রাত পার করেছি।

বাবাকে নিয়ে একটি স্মৃতি এখনও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। আগেই বলেছি, বাবা সারাদিন হাটবাজারে থাকতেন। বিড়ি বিক্রির জন্যই হাটে থাকা।

সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বাবা পদ্মায় মাছ ধরতে যেতেন। বাবা মূলত ইলিশ মাছ ধরতে পছন্দ করতেন। আমি বাবার সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরতাম। অনেক গভীর পানি। বাবা নিতে চাইতেন না। তবুও জোর করেই যেতাম। আহ! তাজা ইলিশ। জাল থেকে ছাড়িয়ে যখন নৌকায় তোলা হতো, তখন কি যে আনন্দ পেতাম, তা প্রকাশ করার মতো নয়। সকালে বাড়ি আসার পথে সবাই বলতেন, ভাই আজ কয়টা পাইছেন। আমি বলে দিতাম। বাবার সঙ্গে সেই মধুর স্মৃতি আমাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। অবুঝকালের এমন স্মৃতি সবার জন্যই মধুর।

বাবা ছিলেন রসিক মানুষ। পকেটে টাকা নেই, তাতে কী হয়েছে। অন্যের কাছ থেকে ধারদেনা করে হলেও রসিক মানুষেরা ভালো খান, ভালো পরেন। এটি সংস্কৃতিমান মানুষের বৈশিষ্ট্য। একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ কখনও কৃপণ হতে পারে না। একজন আলোকিত মানুষ টাকার অভাবে অন্ধকারে থাকতে পারেন না। আমার বাবা শিক্ষিত ছিলেন না, অঢেল সম্পত্তির মালিক ছিলেন না বটে, কিন্তু গানবাজনা আর খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মনটাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

গ্রামে অনেকেরই অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু এক কাপ চাও অন্যেকে খাওয়ানোর মানসিকতা ছিল না। আর আমার বাবা নিজের টাকায় খেলার টিম রাখতেন। এটি সবার পক্ষেই সম্ভব নয়। বাবা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারতেন। মন মজিয়ে ব্যয় করেছেন। বলতে পারেন, পরিবারে অভাব ছিল না, আবার সম্পত্তিও ছিল না।

এ কারণেই মা কোনোদিন বাবার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য করেননি। আমরাও বাবার ভালোবাসাকে খুব কাছে থেকে স্পর্শ করেছি। বাবা আমাদের কোনোদিন অভাব বুঝতে দেননি।

বাবা আমাদের কত ভালোবাসতেন তার একটি নমুনা বলি। আমের মৌসুমে বাবা নৌকা নিয়ে রাজশাহী যেতেন। নৌকা বোঝাই করে আম এনে বাজারে বিক্রি করতেন। লাভের অংশ তিনি বিক্রি করতেন না।

বাড়িতে এনে আমাদের খাওয়াতেন। সারা মাস ভরে আমরা আম খেতাম। চালানও থাকল, আমও খাওয়া হলো। বাবা তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এভাবেই আমাদের আগলে রাখতেন।

**সাবু :** এ সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন দেখেছেন?

**মতিউর :** আগে তো মানুষের মাঝে নোংরা প্রতিযোগিতা ছিল না। এখন একজনের ছেলে দুবাই গেলে আরেকজনের ছেলেকে আমেরিকা পাঠানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আগে এমনটি ছিল না। একটি গরু সাত ভাগে কোরবানি দিয়ে গোটা গ্রামে আনন্দ প্রকাশ পেত। এখন জনে জনে কোরবানি করেও কোনো আনন্দ হয় না। আর্থসামাজিক অবস্থা এখনকার থেকে অনেক খারাপ ছিল বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যেকার আনন্দ ছিল, উৎসব ছিল, ছিল সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি। এখন হিংসা ছাড়া কিছুই পাবেন না।

**সাবু :** স্কুলে গেলেন কখন?

**মতিউর :** শৈশবে স্কুলে মনোযোগী ছিলাম না। স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনের ঘটনা। বর্ষাকাল। সকালেই আমি নদীতে গোসলে নেমেছি। মা লাঠি হাতে করে আমাকে পানি থেকে তুলতে এসেছেন। ভয়ে ভয়ে উঠলাম। এরপর নৌকায় করে স্কুলে পাঠিয়ে দিল। নৌকা ছাড়া স্কুলে যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। প্রথম স্কুলে গেলাম। আসার সময় আরেকটি নৌকার সঙ্গে আমার নৌকাবাইচ শুরু হয়ে গেল। আহ! কি আনন্দ। সারা রাত আর ঘুম হলো না। স্কুল না যতটা মনে ধরল, তার চেয়ে অনেক বেশি নৌকাবাইচের কথা মনে হলো। পরের দিন সকালেই স্কুলের উদ্দেশে রওনা। আর আমাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য খুঁজতে হলো না। বলতে পারেন, ওই দিনের নৌকাবাইচই আমার স্কুলে যাওয়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

**সাবু :** শৈশবের দুরন্তপনার মধ্য দিয়েই স্কুলে পা রাখা। কেমন লাগল?

**মতিউর :** আমার নানির বাড়ির কাছের শিক্ষক আফজাল উদ্দিন স্যারের কাছে আমার পড়ালেখায় হাতেখড়ি। স্যার খুব সংস্কৃতিমনা ছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। আফজাল স্যার নিজেই আয়োজন করতেন। যে যে গান জানত, স্যার তাদের গান করতে অনুরোধ করতেন।

গানের প্রতিযোগিতায় ঢুকে গেলাম। কার ওপরে কে ভালো করতে পারে, তা নিয়ে সবাই অস্থির। রেডিও শুনে গান লিখে রাখতাম। ওভাবেই সুর দেয়ার চেষ্টা করতাম। নজরুলসংগীত ভালো লাগত। 'রাসুল নামের কে এলো রে, সোনার মদীনায়' গানিটি শৈশবেই মুখস্থ করেছিলাম। সেই গান, সেই সুর ভোলার নয়।

এভাবেই গানের সঙ্গে পরিচয়, গান নিয়ে খেলা করার মগজ তৈরি হতে থাকল। বৃহস্পতিবার ছিল আমাদের শৈশবের গানের মেলা। মেলায় কিছু একটা প্রদর্শন করতেই হতো।

আমার গানের জগতের ভিতটা প্রাথমিক স্কুলেই রচিত হয়। পড়ালেখার চেয়ে আমি গান নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতাম।

**সাবু :** আপনি রেডিওতে গান শুনে লিখে রাখতেন? কোন প্রেক্ষাপটে এভাবে গান লিখে রাখা?

**মতিউর :** একবার এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অবাক হই। আত্মীয়ের বাড়ির কাছে কাকন নামের এক প্রতিবন্ধী ছিলেন। একটি পা ছিল না। মুদির দোকানদার। দোকানে গিয়ে বসেই দেখি ব্যাংকের মোটা ভলিউমের মতো অনেকগুলো খাতা। আমি জিজ্ঞাস করলাম, ভাই এগুলো কী? তিনি একটি খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, খুলে দেখ। দেখলাম, প্রতি পাতায় গান লেখা। অনেক সুন্দর হাতের লেখা। বললাম, এত গান কে লিখেছে? বলল, আমি। বললাম, কীভাবে? শোনালো কাহিনি। অনেক আগের একটি রেডিও ছিল তার, প্রায় ১৫ বছর ধরে গান শুনেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তা লিখে রেখেছেন। একেক ধরনের গান একেক খাতায়। একেক শিল্পীর গান একেক খাতায়। সিরিয়াল করা। কেউ গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সঙ্গেই খাতার পাতা উল্টিয়ে গানের গীতিকার, সুরকারের নাম বলে দিত। এত সুন্দর সাজানো কাজ হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। প্রায় ২০ হাজার গান তার কাছে তখন লেখা ছিল। 'কলসি কাঁখে ঘাটে যায়' শিরোনামের গানটির কথা জিজ্ঞাস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুরকার, গীতিকারের নাম বলে দিল। তখন হাইস্কুলের ছাত্র আমি। এমন নিপুণ হাতের কাজ দেখে আমি রীতিমতো অবাক। আমার কাছে মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আর্কাইভস কাকন ভাই।

কাকন ভাইয়ের কাছ থেকে দেখে আমি রেডিও শুনে গান লিখতে শুরু করলাম। আমিও প্রায় হাজার দশেক গান খাতায় লিখেছিলাম।

**সাবু :** তাহলে আপনিও তো জীবন্ত আর্কাইভস।

**মতিউর :** দশ হাজার গানের ব্যাপারেই আমার তখন সম্যক ধারণা ছিল। প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়। এখনও কোনো গানের সুরকার, গীতিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে আমার বয়সীরা আমাকে ফোন দেয়। আমি ঠিক করে দিই। আব্দুল আলীমের ৬০০ গান লেখা ছিল। এই কাজটি আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। গান শুনে, লিখে গানের ব্যাপারে ধারণা সৃষ্টি হতে থাকল।

**সাবু :** এরপরই কি নিজের গান রচনা শুরু?

**মতিউর :** হ্যাঁ, এরপর থেকেই আমি গান লিখে চিঠির খামে করে বাংলাদেশ বেতারে পাঠাতে শুরু করলাম। আমার গানের ফিডব্যাক পাঠানো হতো মাঝে মাঝে। গানের দুর্বলতা নিয়ে পরামর্শ লিখে দিত। গান ভালো হয়নি, তা বলত না। বলত, চেষ্টা করলে অনেক ভালো হবে। যারা আমাকে চিঠি লিখতেন পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। তারা একদিন আমার সব চিঠি দেখালেন। এত বেশি চিঠি লিখেছি, যে কারণে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াই এক প্রকার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়।

গানের অনুরোধ করে নিজের নামের সঙ্গে গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের নাম লিখে পাঠাতাম। পরের দিন স্কুলে গেলে সবাই বলতেন, তোমার অনুরোধের গান আমরাও শুনেছি। তখন খুব ভালো লাগত। এরপর তো ঢাকায় এসে নিজেই গানের মানুষ হয়ে গেলাম।

**সাবু :** বাবার ব্যবসায়ে সহায়তা করতে মন চায়নি?

**মতিউর :** '৭০,'৭১ সাল। গ্রামে তখন খুবই অভাব। বড় সংসার। চার ভাই, তিন বোন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত থেকে শালপাতা আসা বন্ধ হয়ে গেল। শালপাতা একমাত্র ভারত থেকে আসত। এখনও কলকাতায় শালপাতার বিড়ি পাওয়া যায়। আমি এখনও কলকাতায় গেলে শালপাতার বিড়ি দেখে বাবার স্মৃতিচারণা করি।

বিড়ির ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়ার পর বাবা অভাবে পড়ে গেলেন। এরপর বাবা গ্রাম থেকে ডিম কিনে আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় করে ঢাকার বাদামতলীতে এনে বিক্রি করা শুরু করলেন। ঢাকায় ডিম বিক্রি করে ফিরতি পথে নৌকায় করে বিড়ি, সিগারেট নিয়ে গ্রামের বাজারে গিয়ে বিক্রি করতেন। ৫০ টাকায় সিগারেট কিনে নিয়ে দোহারে ৫০০ টাকায় বিক্রি করা যেত। ডিমেও ব্যাপক লাভ হতে থাকল। কারণ তখন তো সব জিনিসই আনা-নেয়া বন্ধ। গ্রামের জিনিস শহরে যায় না, শহরের জিনিস গ্রামে যায় না। বাবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা বাইতেন। অনেক সময় পাকসেনাদের গুলির মুখোমুখি হয়েছেন।

বাবা তখন আমার ছোট ভাইয়ের সহায়তা নিলেন। বাবা ঢাকা থেকে সিগারেট নিয়ে ছোট ভাইকে দিতেন। ও গ্রামের হাটে নিয়ে কয়েক গুণ বেশি দরে বিক্রি করতে থাকল। পনের দিনের মধ্যেই বাবার পুঁজি অনেকগুণ বেড়ে গেল। বাবা তখন গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তি।

**সাবু :** কেমন দেখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ?

**মতিউর :** আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। সারা দেশে আন্দোলন চলছে। ঘন ঘন হরতাল-অবরোধ হচ্ছে। বড় ভাইয়েরা এসে বলতেন, অমুক দিন অমুক জায়গায় যেতে হবে। চলে যেতাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগের কথা। ছাত্রলীগ আর ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া আর কোনো সংগঠন ছিল না। স্বাধীনতার প্রশ্নে দুটি সংগঠনই এক। বিরোধী পক্ষ ছিল না বলে কর্মসূচি পালন করতাম আনন্দের সঙ্গে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের প্রধান শিক্ষক এম এ মজিদ স্যার যুদ্ধে যোগ দিলেন। আমাদের এলাকা ছিল ২ নং সেক্টরের অধীনে। খালেদ মোশাররফ এই সেক্টরের কমান্ডার। মানিকগঞ্জের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী। তার নেতৃত্বে শিক্ষিতরা প্রথমে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে থাকলেন।

হেড স্যার একদিন আমাদের ডেকে বললেন, দেশ স্বাধীন করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে। যারা লম্বা আছো, তারা নাম লেখাবে। আমরা খুশিতে নাম লেখালাম।

বাড়িতেই একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা প্রশিক্ষণ নিতে থাকলাম। সবাই লুঙ্গি আর সাদা গেঞ্জি পরে রাতভর প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করলাম। এরপর আমাদের অস্ত্র দেয়া হলো।

বর্ষাকাল চলে এলো। আমরা নৌকায় করে নদীতে অবস্থান নিয়ে এলাকা

পাহারা দিতে থাকলাম এবং মুক্তিযুদ্ধদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলাম। তবে আমাদের সেই অর্থে যুদ্ধ করতে হয়নি। আমাদের পুরো এলাকা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি।

যোগদানের পর থেকে আমি পুরো নয় মাসই মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম। আমাদের দায়িত্ব ছিল গ্রাম আর বাজারঘাট পাহারা দেয়া, যাতে রাজাকার, আলবদর বাহিনী লুটপাট করতে না পারে।

জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকে আমরা সার্টিফিকেট নিয়েছি। স্বাধীনতার পরও আমাদের দেড় মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। সংগীতশিল্পী ফকির আলমগীরও সে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

**সাবু :** বঙ্গবন্ধুকে দেখেছিলেন?

**মতিউর :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু একবার আমাদের থানায় গিয়েছিলেন, লঞ্চে করে। তখন তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলাম। সেই প্রেম আজও রয়ে গেছে। যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হাত মেলালাম, মনে হলো হিমালয়ের চূড়ায় স্পর্শ করলাম। বঙ্গবন্ধু মানেই তখন বাংলাদেশ। তার ডাকে সারাদেশ ঐক্যবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হাত মিলানোর পরই রাজনীতি নিয়ে বিশেষ ভাবনা চলে এলো। সেই ভাবনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী হই।

১৯৭৪ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম যে গেজেট প্রকাশ হয়, সেই গেজেটেই আমার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**সাবু :** মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা ব্যবসা করতেন। আপনি মুক্তিযুদ্ধে, বাবা-মা বাধা দেননি?

**মতিউর :** না। পরিবারের দায়িত্বের কারণে বাবা হয়তো মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেননি, কিন্তু আমার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। বাবা জানতেন আমি ঘরে বসে থাকার মানুষ নই। আর আমার পরিবার ছিল সংস্কৃতিমনা, খোলা মনের। এই রকম পরিবারের সদস্যরাই মুক্তিযুদ্ধে যেতে পেরেছে।

**সাবু :** পরীক্ষার বছর মুক্তিযুদ্ধ। পরীক্ষা দিলেন কবে?

**মতিউর :** আমার পরীক্ষা দেয়ার কথা ১৯৭২ সালে। ওই বছর অনেকেই পরীক্ষা দেয়নি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম, তাদের কারও পক্ষেই পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। স্কুল, পড়াশোনা কিছুই করতে পারিনি। প্রস্তুতি নিয়ে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিই।

**সাবু :** ঢাকায় এলেন কেন? কবে এলেন?

**মতিউর :** ঢাকায় আসি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে। ১৯৭৫ সালে, জুরাইন আদর্শ মহাবিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড আমার জীবনের ছন্দপতন ঘটায়। আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম, তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমরা দিশেহারা।

এই হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নীরব হয়ে পড়ল। আমরা আর সেইভাবে রাজনীতি করতে পারলাম না। এরপরই ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নিই।

**সাবু :** বঙ্গবন্ধুর হত্যার কথা কখন জানতে পারলেন?

**মতিউর :** বাড়ির পাশের সাঁকো পার হলেই বাছের কাকার মুদির দোকান। খুব সহজ মানুষ বাছের কাকা। ওই দিন একটু বেলা করে ঘুমিয়েই ছিলাম। বাছের কাকা দোকান খুলে রেডিও ছাড়তেই ঘোষণা শুনতে পান, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কথা। সে দোকান বন্ধ করেই চিৎকার করে গ্রামে দৌড়াচ্ছে আর বলছে, 'তোরা কেডা কই আছোস, বের হ। শেখেরে মাইর্যা ফেল্যাইছে। লাঠিসোটা নিয়া আয়।' আমরা ঘুম থেকে উঠে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পরে রেডিও ছাড়লাম। সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

**সাবু :** এরপর কী করলেন?

**মতিউর :** এমন সংবাদের জন্য কেউই প্রস্তুত থাকে না। মনে হলো, পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ মেঘে ঢেকে গেল। চোখে অন্ধকার দেখতে পেলাম।

পরে মাইকে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ বিকেলে একত্র হয়ে মাঠে প্রতিবাদ সভা করলাম। আসলে পরিস্থিতি এমন ছিল, দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের কিছুই করার ছিল না। তিন দিন রেডিওর কাছেই সময় কেটেছে। দেশে কী হচ্ছে, তা জানার জন্যই অস্থির ছিলাম।

**সাবু :** এ রকম একটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানুষের রাস্তায় নামার কথা?

**মতিউর :** বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সবাই হতবিম্ব। সবার মধ্যেই প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারছে না। ডাক দেয়ার লোক নেই। এমনকি জিয়াউর রহমান ডাক দিলেও রাস্তায় কোটি কোটি মানুষ নেমে আসত।

জনপ্রিয়তা হয়ত কমে ছিল বটে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তো নিজস্ব কর্মী বাহিনী ছিল। তারাও মাঠে নামতে পারেনি একমাত্র আতঙ্কে। কারণ বঙ্গবন্ধুকে যখন মারা হয়েছে, তখন কেউ আর নিজের পায়ের নিচের মাটিকে শক্ত মনে করেনি। মূলত সেনাবাহিনী এবং আওয়ামী লীগকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর কারণেই সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করে।

**সাবু :** ঢাকায় এসে কী করলেন?

**মতিউর :** তখন আমাদের এলকায় ডিগ্রি কলেজ ছিল না। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর মনোবল ভেঙে গেল। এলাকায় আর রাজনীতিও ওইভাবে করতে মন চাইল না। ডিগ্রি ভর্তি হওয়ার মনোবাসনা নিয়েই ঢাকায় এলাম। পাশাপাশি একটি চাকরির প্রয়োজনও অনুভব করলাম। লঞ্চে করে ঢাকায় এলাম। আসার সময় মা আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বাবার তফিল থেকে মা চুরি করে এই টাকা জমিয়েছিলেন। ১০ টাকার একটা বান্ডিল।

**সাবু :** এই অবস্থায় ঢাকায় এলেন। মা টাকা দিয়ে সহযোগিতা করলেন। তার মানে পরিবারও চাইল আপনি ঢাকায় যান।

**মতিউর :** আমার ভাবনার সঙ্গে পরিবারের ভাবনার মিল ছিল। আমি ঢাকায় এসে পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু একটা করব, তা হয়ত পরিবারও চাইছিল। আমি ভালো কিছু করি, মা তা মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করতেন।

**সাবু :** ঢাকায় এসে কোথায় উঠলেন?

**মতিউর :** সদরঘাটে নেমে খিলগাঁওয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় এলাম। শিল্পী আব্দুল আলীমের বাসার ঠিক উল্টো দিকের বাসাই ছিল আমার ওই আত্মীয়ের বাসা। সে আমার গ্রামের। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন।

**সাবু :** আব্দুল আলীমের গান রেডিওতে শুনেই মাতোয়ারা। এবার বাসার কাছে এলেন। কেমন ছিল সে অনুভূতি?

**মতিউর :** আব্দুল আলীম সাহেব ১৯৭৪ সালে মারা যান। আমি আসি ১৯৭৫ সালে।

আব্দুল আলীমের বাসার কাছে থাকছি, সে অনুভূতি প্রকাশ করার মতো নয়। গান শুনে আব্দুল আলীমকে দেখার জন্য রেডিওর পেছনে তাকিয়ে থেকেছি। যখন শুনলাম, এটি আব্দুল আলীমের বাড়ি তখন খুশিতে আত্মহারা।

আব্দুল আলীমের বড় ছেলে জহির আলীমের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হয়ে গেল। প্রায় সমবয়সী। আমি ইচ্ছা করেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম। মাঝে মাঝে চা-নাস্তা করাতাম।

**সাবু :** জহির আলীমও কি তখন গান করতেন?

**মতিউর :** হ্যাঁ, সে তখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। কোথাও গান করতে গেলেই আমাকে ডেকে নিত। শুরু হলো আমার নতুন যাত্রা। প্রথম দিন তার সঙ্গে রিকশায় করে গিয়ে তো অবাক। যে জায়গায় নিয়ে গেলেন, সেখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের আড্ডা চলছে। আমি তো বিস্মিত হলাম। এরপর কুটি মনসুর, কানাই লাল শীল, সাইদুল হক চৌধুরী, আনিসুল হক চৌধুরী, ওসমান খানের দেখা মিলল। দেখা মিলল নীনা হামিদ, কাজী সুরাইয়ার। জহির আলীমের সঙ্গ পেয়ে শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, যন্ত্রীদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেলাম। আমাকেও পরিচয় করিয়ে দিতে থাকল। ডায়রিতে সবার ঠিকানা লিখে রাখতে শুরু করলাম।

জহির আলীম পাসের ব্যবস্থা করে আমাকে একদিন টেলিভিশন ভবনেও নিয়ে গেলেন।

**সাবু :** আপনি তো বেকার। তার মানে অনেকটাই ভবঘুরে...

**মতিউর :** হ্যাঁ, অনেকটা তা-ই। তবে কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগছে আর কি। মায়ের দেয়া এক হাজার টাকা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে কাপড় এনে গুলিস্তানের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে শুরু করলাম। বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ পাশের গেটে ফুটপাত দখল করে তখন ভিটি বিক্রি হতো এক টাকা, দুই টাকা করে। একটি ভিটি কিনে আমি সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে কাপড় বিক্রি করতাম।

**সাবু :** এই ভাবনা মাথায় এলো কেন?

**মতিউর :** আমাকে তো কিছু একটা করে খেতে হবে। মায়ের দেয়া টাকা শেষ হলে বিপদে পড়তে হবে। অন্যের কাছে হাত বাড়ানো আমার অভ্যাস ছিল না। এই ভাবনা থেকেই কাপড় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই। সামান্য

কিছু লাভ হতো।
মনের মধ্যে তো এক প্রকার পাগলামি ছিল। ভিন্ন কিছু করাই ছিল আমার স্বপ্ন। ঢাকায় থাকা-খাওয়ার জন্য তখন আমার মাসে ৬০০ টাকার প্রয়োজন হতো। ৬০০ টাকার একটি চাকরি হলেই আমার চলে যেত।
**সাবু :** তখনও কি আত্মীয়ের বাড়ি?
**মতিউর :** না। ব্যবসা শুরু করার পরেই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে চলে আসি। কারণ তখন আর সেখানে থাকাটা শোভনীয় মনে হলো না। মুগদায় একটি মেসে থাকতে শুরু করলাম। সেখানে আমার এক আত্মীয় থাকতেন। তার সঙ্গে একই চৌকিতে ঘুমাতাম। মনে আছে, জায়গা সংকুলান না হওয়ায় দুই জন দুই দিকে মাথা দিয়ে ঘুমাতাম। কখনও তার বুকের ওপর আমার পা, আবার আমার বুকের ওপর তার পা থাকত। কষ্টের ছিল কিন্তু অনেক মধুর স্মৃতি।
**সাবু :** এরপর?
**মতিউর :** একদিন একটি সাবান ফ্যাক্টরির বিজ্ঞাপন দেখলাম। আমিও দরখাস্ত করলাম। অল্প বেতনের চাকরিটি হয়ে গেল। তখন ব্যবসা ছেড়ে দিলাম। ঢাকার সোড়ানের ফ্যাক্টরিতে কাজ শুরু করলাম। মালিক খুব ভালোবাসতেন।
**সাবু :** ফ্যাক্টরিতে আপনার কী কাজ ছিল?
**মতিউর :** আমি টুকটাক হিসাব-নিকাশ করতাম। ভালো করছি বলে আমার বেতন বেড়ে গেল। আমি মিটফোর্ড থেকে কেমিক্যাল আনতে যেতাম। সেখানেও আমাকে বকশিস দেয়া হতো। খুব ভালো কাটতে শুরু করল।
**সাবু :** ডিগ্রিতে ভর্তি হলেন না?
**মতিউর :** এরই মধ্যে আমি সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ডিগ্রির নাইট শিফটে ভর্তি হলাম। দিনে চাকরি করি, রাতে কলেজ করি।
**সাবু :** ব্যাংকে চাকরি নিলেন কখন?
**মতিউর :** ডিগ্রি পড়ছি। এরই মধ্যেই রূপালী ব্যাংকে পরীক্ষা দিলাম। মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি, বোর্ডে আমার এলাকার শাহজাহান সাহেব রয়েছেন। আমি তাকে চিনি না। পরিচয় দেয়ার পর তিনি আমার সবই চিনলেন। ব্যাংকের ডিজিএম ছিলেন।
তিনি একটু অবাক হলেন যে, আমি চাকরির জন্য আবেদন করেছি। কারণ তখন দোহারের মানুষ চাকরি করত না। ব্যবসা করত। আমার আত্মীয়স্বজন কেউই চাকরি করতেন না।
শাহজাহান সাহেব ভাইভা বোর্ডেই আমার চাকরি নিশ্চিত করলেন। ১৯৭৭ সালের ১১ নভেম্বর ক্যাশিয়ার কাম অফিসার পদে যোগদান করলাম।
প্রথমে সদরঘাট শাখায়, পরে শ্যামলীতে বদলি হই। ব্যাংকে আট বছর চাকরি করি। ব্যাংকের চাকরি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ভবঘুরে জীবন, ফুটপাতের ব্যবসা, সাবান ফ্যাক্টরিতে কাজের অবসান ঘটল। নিয়ন্ত্রিত জীবন। বলতে পারেন জীবনের ফাঁদে আটকা পরে গেলাম। একদিকে লাভ, অন্যদিকে ক্ষতি। কারণ তখন মিউজিক লাইনে খুব সময় দিচ্ছিলাম। সময় বের করা বেশ কষ্ট হলো।
চাকরি পাওয়ার পর ফের খিলগাঁওয়ের কাছে একটি বাসা নিলাম। কারণ আমার টান রয়েছে আব্দুল আলীমের বাসায়। অফিস করেই জহির আলীমসহ দুজনে বের হতাম। দুজনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সবাই মনে করত আমি আব্দুল আলীমের পরিবারেরই একজন সদস্য। এ সম্পর্ক এখনও বজায় রয়েছে।
**সাবু :** গানের মানুষ ব্যাংকার হলেন। মনে ধরল?
**মতিউর :** অন্তত সাবান ফ্যাক্টরির কাজ থেকে ভালো ছিল। আমি তো কাজের মানুষ। কিছু একটা তো করা দরকার। এখানে ভাগ্য খুব প্রসন্ন হয়।
**সাবু :** কীভাবে?
**মতিউর :** একদিন এক ভদ্রলোক একটি ব্যাগ আমার কাছে রেখে বললেন, হাসান সাহেব এটি রাখেন, কাল এসে নিয়ে যাব। আমি ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। কিন্তু দেড় মাসেও তিনি আসেননি। একদিন ব্যাগ খুলে দেখি ৮৯ হাজার টাকা রয়েছে।
এত টাকা এভাবে রেখে গেলেন, অবাক হয়ে গেলাম। আমি কারও সঙ্গে শেয়ার না করেই আবারও ড্রয়ারে রেখে দিলাম। আমার ব্রাঞ্চে ওই ব্যক্তির বিভিন্ন নামে দেড়শর মতো অ্যাকাউন্ট রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সুতার ব্যবসায়ী। নাম শামসুদ্দিন মাস্টার। অনেক দিন পর ব্যাংকে এসে লেনদেন

> ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু একবার আমাদের থানায় গিয়েছিলেন, লঞ্চে করে। তখন তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলাম। সেই প্রেম আজও রয়ে গেছে। যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হাত মেলালাম, মনে হলো হিমালয়ের চূড়ায় স্পর্শ করলাম। বঙ্গবন্ধু মানেই তখন বাংলাদেশ। তার ডাকে সারাদেশ ঐক্যবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হাত মেলানোর পরই রাজনীতি নিয়ে বিশেষ ভাবনা চলে এলো। সেই ভাবনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী হই। ১৯৭৪ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম যে গেজেট প্রকাশ হয়, সেই গেজেটেই আমার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল

করে চলে গেলেন। আমি কিছু বললাম না। পরের দিনই একই ঘটনা। এর পরের দিন ব্যাংকে আমি তাকে ডেকে এনে পাশে বসালাম।
বললাম, মাস্টার সাহেব দেড়-দুই মাস আগে কই গিয়েছিলেন? ব্যাংকে আসেন না কেন? বললেন, দেশের বাইরে ছিলাম, চিকিৎসার জন্য।
তিনি আবার মাঝে মাঝে আমাকে ৫০০ টাকা করে আমাকে বকশিশ দিতেন, তার অ্যাকাউন্ট দেখার জন্য। অনেক দিন পর এসেছেন বলে, পকেট থেকে ২ হাজার টাকা বের করে দিয়ে বললেন, বেশ কিছু দিন হয় দিইনি। এই টাকা রাখেন।
আমি তখন ড্রয়ার থেকে ব্যাগ বের করে বললাম, এটি রেখে গেলেন আর তো নিতে এলেন না। ব্যাগ তো টাকা দিয়ে ভরা। উনি যেন মনেই করতে পারছেন না। পরে মনে পড়ল। ব্যাগ থেকে তখন ১০ হাজার টাকা বের করে আমাকে জোর করে বকশিশ দিলেন।
শধু তা-ই নয়, প্রতি মাসের ১ তারিখে আপনার অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার করে টাকা জমা দেব এবং তিন মাস পরপর একটি করে রিকশা কিনে দেব। আপনি গ্যারেজ দেখুন। আপনি আমার অ্যাকাউন্টগুলো যেভাবে দেখছেন, অনেকেই সেভাবে দেখেনি। টাকা ফেরত দিয়ে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তা প্রতিদান দেয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই।
সাবু : কথা রাখলেন?
মতিউর : বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে, তার কথা মিস হলো না। প্রতি মাসে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিলেন। যতদিন আমি সদরঘাট ব্রাঞ্চে ছিলাম, ততদিনই এভাবে তিনি সহায়তা করেছেন।
সাবু : এমন একজন মানুষকে ব্যক্তি জীবনে কেমন দেখেছেন?
মতিউর : তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। জীবনে ভালো মানুষ অনেক দেখেছি, কিন্তু অমন সৎ, ভালো মানুষ খুব কমই দেখেছি।
এত সুন্দর চেহারা ছিল, দেখলেই মনে হতো তার দিলটা অনেক বড়। ঠিক তা-ই ছিল। তার সঙ্গে আমার এমন এক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল, যা

দেখে আমার সহকর্মীরা হিংসা করতে থাকলেন। পরে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আমাকে শ্যামলী শাখায় বদলি করলো। শ্যামলী শাখায় থেকেই চাকরি ছেড়ে দিই।

**সাবু :** চাকরি ছাড়লেন কখন?

**মতিউর :** ১৯৮৭ সালে চাকরি ছেড়ে দিই। মুজিব পরদেশীর ক্যাসেট করার পর চাকরি ছেড়ে দিই।

**সাবু :** নানা অস্থিরতা দিয়েই জীবনের গাঁথুনি। এমন অস্থিরতার মধ্যে বিয়েও করলেন? প্রেম গুরুত্ব পায়নি?

**মতিউর :** ১৯৭৬ সালে বিয়ে হয়। ওর বাড়ি আমার বাড়ির পাশেই। ওদের অবস্থা আমাদের থেকে অনেক ভালো ছিল। গ্রামের সচ্ছল পরিবার। ওর বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি সম্পর্ক ছিল। রাতে মাঝে মাঝে ও বাড়িতেই থাকতাম। এর মধ্যেই একে-অপরকে জানতে চেষ্টা করি। ও তখন হাইস্কুলের ছাত্রী। আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছি।

ওর পরিবার চাইত না যে আমাদের পরিবারে ওর বিয়ে হোক। ওর বাবা-মা ইন্ডিয়ায় থাকতেন। ওর ভাই এবং আত্মীয়স্বজনের কেউ কেউ আমার প্রতি ভরসা রেখে পজেটিভ সিদ্ধান্ত নিলেন। আর ওর সিদ্ধান্ত তো আগেই জানতে পেরেছিলাম। প্রেম বলতে এটুকুই। তবে বিয়ে হয় পারিবারিকভাবেই। বিয়ের পর সবারই কাছের মানুষ হয়ে যাই। যাদের অমত ছিল, তাদেরই প্রিয় জামাই হয়ে উঠলাম। এখনও ওর বংশে আমিই শ্রেষ্ঠ জামাই।

**সাবু :** আপনি গান করতেন। রেডিও, টেলিভিশনের আপনি তালিকাভুক্ত শিল্পী। গান ছেড়ে লেখায় মন দিলেন কখন?

**মতিউর :** হ্যাঁ, শিল্পী হওয়াই জীবনের টার্গেট ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনতে হয়।

মিউজিক লাইনে আমার যারা নিকটজন ছিলেন, তারা বললেন, তুমি গান গাওয়ার চাইতে গান লিখতে পারো ভালো। তোমার লেখা পল্লীগীতি গানে ভাব আছে, নতুনত্ব আছে। তুমি গান লিখেলেই অনেক নাম করবা। এরপরেই আমি চট করে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়ে লেখায় মন দিতে থাকলাম। লেখার তাগিদটা নিজেও অনুভব করেছিলাম। কারণ পর্দার আড়ালে থাকারও এক প্রকার আনন্দ আছে।

**সাবু :** এই সময়টা কখন?

**মতিউর :** গান লেখার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় ১৯৭৭-১৯৭৮ সালের মধ্যেই। তখন আমি বেতারের বিখ্যাত শিল্পী কুটি মনসুরের কাছে গান শিখতাম। ওস্তাদের বাড়ি ফরিদপুরে ছিল।

**সাবু :** তার সঙ্গে কখন পরিচয়?

**মতিউর :** জহির আলীমের মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয়। তার কাছেই আমি গানের তালিম নিতাম। হাতিরপুলে একটি ছোট বাসায় থাকতেন।

আমরা যারা গান ভালোবাসতাম, তাদের কাছে কুটি মনসুর ছিলেন স্বপ্নের মানুষ। রেডিওতে শত শত গান শুনে কুটি মনসুরকে আমি না দেখেই গুরু মানতাম।

এখানেও আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়। প্রথম পরিচয়ে জানতে পারি তিনি দোহারে বিয়ে করেছেন। আমার বাড়ি দোহারে জানতে পেরে ওস্তাদের স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন, দোহার থেকে কে এসেছে? ওস্তাদ বলল, দেখ তোমার ভাই এসেছে।

এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার কোনো ভাই নেই। আজ থেকে তুমি আমার ভাই। ওস্তাদকে হুকুমস্বরূপ বললেন, আজ থেকে তুমি আমার ভাইকে ভালো করে গান শেখাবা। ভাগ্য খুলে গেল। গানের স্বর্গে প্রবেশ করলাম। শ্যামলীতে বিকেল চারটা পর্যন্ত অফিস করে হেঁটে হেঁটে হাতিরপুলে ওস্তাদের বাসায় আসতাম। রাত ১০/১১টা পর্যন্ত গান শিখে বাসায় যেতাম।

**সাবু :** কেমন ছিল সেখানকার গান শেখার পরিবেশ?

**মতিউর :** সন্ধ্যার পর সেখানে গানের মেলা বসত। প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ জন করে মানুষ সেখানে গান শিখতে আসত, যাদের বেশির ভাগই বেতার, টেলিভিশনে গান করতেন। অনেক নামিদামি শিল্পীও রেওয়াজ করতে আসতেন।

ওস্তাদ কানাই লাল শীলও একই বাসায় ভাড়া থাকতেন। কানাই লাল শীল ছিলেন দোতরার জাদুকর। কেউ গান গাচ্ছে, কেউ দোতারা বাজাচ্ছেন।

**সাবু :** সেখানে আপনার অবস্থান কী?

**মতিউর :** একবার মৎস্য অধিদপ্তর থেকে মাছ চাষের গুরুত্ব বুঝিয়ে কুটি মনসুরকে দিয়ে গান লেখার ফরমায়েশ করলেন। তিনি আমার মতো দশজনকে গানটি লিখতে দিলেন। তবে কারাও নামে নয়। প্রতিযোগিতায় যে যার গান প্রথম হবে সেটা, বেতার, টেলিভিশনে প্রচার করা হবে।

কুটি মনসুর এবং প্রণব ঘোষ তখন মৎস্য বিভাগে চাকরি করেন। গান লেখার জন্য এক সপ্তাহ সময় দিলেন। সবাই গান লিখে গীতিকার কুটি মনসুরের নাম লিখে জমা দিয়েছি।

এক দিন সন্ধ্যায় সবার মধ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমাদের জন্য খুশির খবর আছে। তোমরা যে গান জমা দিয়েছিলে, সেখান থেকেই একটি গান প্রথম হয়েছে। তিনি আমার নাম ঘোষণা করলেন।

প্রথম হওয়ার জন্য ৫০০ টাকাও দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর। সে আনন্দ দেখে কে। সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলাম।

ওস্তাদের স্ত্রীকে অর্থাৎ পাতানো বোনকে ২০০ টাকা দিলাম শাড়ি কেনার জন্য। এই ঘটনাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। গাওয়ার চেয়ে গান লেখায় মন দিলাম।

**সাবু :** কোন সালের ঘটনা?

**মতিউর :** এটি ১৯৭৮ সালের ঘটনা। জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায়। কৃষিতে বিপ্লব ঘটছে। চাষাবাদে একেবারে জমজমাট অবস্থা।

মাছ চাষের গান লিখেই শিল্পী থেকে আমি গীতিকার। মগজের পরিবর্তন ঘটল। এরপর গান লেখার আরেক ইতিহাস।

একই বছরের পহেলা বৈশাখ। আমি ১৪টি গান লিখে কুটি মনসুরের কাছে জমা দিলাম। কুটি মনসুর ঢাকা রেকর্ডিংয়ে নিয়ে গেলেন। তখন বাংলাদেশের একমাত্র রেকর্ডিং হাউস এটি। 'রূপবান' সিনেমার পরিচালক সালাউদ্দিন সাহেব এর মালিক। সালাউদ্দিন চিত্রকল্পেরও মালিক তিনি। আমার ১৪টি গানই রেকর্ড হলো। সালাউদ্দিন সাহেব একবার দেখার পরই সই করে দিয়ে বললেন, ভাই অসাধারণ লেখা। আমার চোখে পানি। সত্য সাহা এবং ফেরদৌসী রহমান মিউজিক ডিরেক্টর আর সালাউদ্দিন সাহেব হচ্ছেন মালিক। অবাক করা ঘটনা। আজ থেকে ৩৭ বছর আগের কাহিনি। তখন আমার বয়সই বা কত?

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মিউজিশিয়ানরা আমার গান রেকর্ড করছেন। মনে হচ্ছিল, আল্লাহ অতি নিকটে থেকে আমাকে সহায়তা করছেন। দু'পিঠে সাতটি করে মোট ১৪টি গানের লং প্লেতে রেকর্ড বের হলো। আমার আর পেছনে তাকানোর সময় নেই। স্বপ্নের সিঁড়িতে ভর করে আকাশে ওড়ার পথে আমি।

**সাবু :** কারা গাইল?

**মতিউর :** যারা গাইলেন, তারা সবাই বড় শিল্পী। সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া, সুফিয়া, নুরুন্নাহার আউয়ালের মতো গুণী শিল্পীরা আমার লেখা গান গাইলেন। এখন হয়ত অনেকেই এই শিল্পীদের নাম জানেন না। কিন্তু তখন এদের কণ্ঠে গান না শুনলে গান শোনার সার্থকতা থাকত না।

**সাবু :** কীসের ওপর লেখা ছিল গানগুলো?

**মতিউর :** বিয়ের গান ছিল। তখন বিয়ের গান খুব চলত। মাইকে বিয়ের গান বাজানো হলে মানুষের মধ্যে অন্যরকম এক আনন্দের বাতাস বইয়ে যেত। বিয়ের সাজনি সাজো কন্যা লো শিরোনামের গানগুলো ব্যাপক চলত।

এ পর্যন্ত ৪০০'র মতো পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু ওই সময়ের গানগুলোর রেকর্ডিয়ের অনুভূতি আজও বিশেষভাবে নাড়া দেয়। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক, শ্রেষ্ঠ দোতারা বাদকরা আমার গান রেকর্ড করলেন। সত্য সাহা নির্দেশনা দিলেন। দুপুরে বিরিয়ানি খাওয়ালেন। আহা! কি যে আনন্দ!

হাফ ইঞ্চি ফিতায় রেকর্ড। বাম হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেকর্ড করতে হয়। বারবার রেকর্ড করতে হচ্ছে। ভুল হচ্ছে, আবার সংশোধনও হচ্ছে। সব কাছে থেকে দেখলাম।

**সাবু :** আপনি কি তখন বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার?

**মতিউর :** না। আমি তখনও বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্ত গীতিকার হইনি। আমি বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার হই ১৯৮১ সালে।

আমার ওই গানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দোতরা বাদক অবিনাশ শীল বাজালেন। দোতরার জনক ছিলেন অবিনাশ শীলের বাবা কানাই লাল শীল, যিনি আব্বাস উদ্দিনের সব গানে দোতরা বাজিয়েছেন। আর আব্দুল আলীমের সব গানে দোতরা বাজিয়েছেন অবিনাশ শীল। কানাই লাল শীল ছিলেন

অশিক্ষিত আর অবিনাশ শীল ছিলেন শিক্ষিত। 'আমার হার কালা করলাম রে' ধাচের পুরনো ফোকে ছিলেন কানাই লাল শীল আর আব্দুল আলীমের মডার্ন 'আল্লাহু আল্লাহু, তুমি জাল্লে জালালু' ধাচের ফোক গানে ছিলেন অবিনাশ শীল।

সেই অবিনাশ শীল আমার গানে দোতরা ধরেছেন, ভুল হলে সত্য সাহা আবার ধমক দিচ্ছেন। আজব ঘটনা। অবিনাশ শীলকে দেখার জন্য অস্থির ছিলাম। তারেই আমার গানে পেলাম।

**সাবু :** লং প্লে বের হওয়ার পর কেমন লাগল?

**মতিউর :** সালাউদ্দিন সাহেব আমার ব্যাংকে ফোন দিয়ে জানালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম। তিনি অত্যান্ত গুণী মানুষ ছিলেন। কুমিল্লায় বাড়ি ছিল। কলেজের শিক্ষক ছিলেন বলে সকলের স্যার ছিলেন। তিনি যখন লং প্লেটি আমার হাতে দিলেন, তখন মনে হলে এর চাইতে ভারী উপহার জীবনে আর হতে পারে না। সব তাদের খরচে।

আমি লং প্লেটি নিয়ে একটি মাইকে বাজালাম। আহ! কি মধুর সুর, কি ছন্দ! সেই দিনের ঘটনা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই।

ওই যে সম্মান পেলাম, আজও তা পিছু ছাড়েনি। গানের খেলায় কি যে ভালোবাসা, কি যে আনন্দ, যে খেলেছে সেই মজেছে।

**সাবু :** সেই সময়ের রেকর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে কী বলবেন?

**মতিউর :** সালাউদ্দিন সাহেবের রেকর্ডিং হাউস ছিল ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে। স্টুডিও ছিল সাভারে। নাম ছিল ঢাকা রেকর্ড বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি। এর আগে ছিল পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড। মালিক যখন এসব রেখে পাকিস্তানে চলে যায়, তখন সালাউদ্দিন সাহেব এর মালিকানা নেয়।

সবাই একটি রুমে বসে বসে গান করতে হতো এবং নাসির ভাই নামের একজন রেকডিস্ট ফোর ট্রাকের মাধ্যমে কণ্ঠ এবং যন্ত্রে সমন্বয় করতেন। হাফ ইঞ্চি ফিতায় রেকর্ড করতে হতো। আঙুল দিয়ে ঘুরাতে হতো। না দেখলে বোঝানো যাবে না।

তবে সবচেয়ে ভালো রেকর্ডিং হতো খান আতাউর রহমানের শ্রুতিতে। শিল্পী আগুনের বাবা। 'জিঙ্গা' শিল্পীগোষ্ঠীর 'ইফসা' নামের আরেকটি রেকর্ডিং হাউস ছিল।

**সাবু :** বিয়ের গান লিখে কোনো সম্মানী পেলেন?

**মতিউর :** সামান্য সম্মানী পেয়েছিলাম। কারণ আমার ওস্তাদ কুটি মনসুর গানগুলো পরিচালনা করেছিলেন। এ কারণেই তার সঙ্গে টাকা নিয়ে দরকষাকষি করিনি। প্রশ্নই ওঠে না।

তবে এর মধ্য দিয়ে আমি যে সম্মান পেয়েছি, তা টাকার অঙ্কে মূল্যায়ন করলে ভুল হবে। কারণ এই রেকর্ডের মধ্য দিয়েই আমার গানের দরজা খুলে গেল।

এক সময় সারা বাংলাদেশে প্রোডাকশন হাউস ছিল প্রায় ৪০০। আর রেকর্ডিং হাউস ছিল মাত্র একটি। সেখানে সিরিয়াল পাওয়াই ছিল রীতিমতো যুদ্ধের ব্যাপার। সবাই সালাউদ্দিন সাহেবের রেকর্ডিং হাউসে গিয়ে পড়ে থাকত।

সেই সালাউদ্দিন সাহেব আমাকে ধরে বললেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। এরপর তিনি আমাকে পাটুয়াটুলির হাজি মোহাম্মদ শাহজাহানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। শাহজাহান সাহেবের সংগীত ঘর নামের একটি প্রোডাকশন হাউস ছিল। সালাউদ্দিন সাহেব বললেন, হাজি সাহেব আপনাকে একটি ছেলে দিচ্ছি। ও ভালো গান লেখে, আপনি খেয়াল রাখবেন।

**সাবু :** শাহজাহান সাহেবকে কেমন পেলেন?

**মতিউর :** একদিন তার দোকানে গেলাম। অনেক আপ্যায়ন করলেন। এরপর তিনি চারটি উর্দু গানের রেকর্ড দিলেন। বাসায় এসে শুনলাম। আমি তখন উর্দু বুঝি না। এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এর মধ্যে একটি গান ছিল 'আল্লাহু আল্লাহ্ কিয়া করো'। নাহিদ আকতারের গাওয়া। অনেক ভালো লাগল। শাহজাহান সাহেব বলে দিলেন, এই গানগুলোয় যে সুর আছে সেই সুরে বাংলা গান লিখবা।

সেই সঙ্গে গান রেডি করে তুমি নিজেই শিল্পী ম্যানেজ করবা। তিনি আমাকে তার হাউসে প্রযোজক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। একেবারে কম বয়সী প্রযোজক আমি। তখন একজন বংশীবাদককেও চিনি না। নতুন শিল্পী ম্যানেজ করার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। কোথায় পাব।

যা-ই হোক, আমার এক পরিচিত বড় ভাইয়ের সহায়তা নিলাম। মুক্তিযোদ্ধা জমির উদ্দিন ভাইয়ের বাড়ি ছিল মেহেরপুরে। বেতারে গান করতেন। হাতিরপুলে একদিন আড্ডা দিতে গিয়ে বললাম, ভাই আমার যে একজন শিল্পী দরকার। ঢাকা রেকর্ডিংয়ে কাজ পাইছি।

ঢাকা রেকর্ডিংয়ে কাজ পেয়েছি শুনে তো তিনি অবাক। তিনি আমাকে শর্ত দিয়ে বললেন, যদি আমাকে একটি গান গাইতে দাও, তাহলে আমি একজন শিল্পী দিতে পারি। যদিও সেই শিল্পী কোনো দিন বাইরে গান করে নাই। ঘরোয়া পরিবেশে গান করে। তার গান শুনলে তোমার ভালো লাগবে।

আমি বললাম, আমি তো গানই ঠিকমতো বুঝি না। ভালো-মন্দ বিচার করব কী। বলল, চলো।

**সাবু :** কোথায় গেলেন?

**মতিউর :** তার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে একটি বাসায় গেলাম। দিলরুবা খানের বাসা। ১৯৮০ সালের কথা। তখন তার ঘরে ৫ জন ছেলেমেয়ে।

দিলরুবা খান একটি হিন্দি গান শোনালেন। এমন সুর, বিশ্বাস করার মতো নয়। বাংলা গানও শোনালেন। কিন্তু হিন্দি গানে মাত করে দিলেন। 'তুমহি মেরে মন্দির, তুমহি মেরে পূজা' গানটি শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। গলায় এত আবেগ থাকতে পারে, ধারণা ছিল না।

আমি জমির ভাইকে বললাম, চলবে। হয়ে গেল। বললাম, কাল থেকে রিহার্সেল করতে আসব। জমির ভাই চারটি গানই হারমোনিয়ামে তুলে ফেললেন। জমির ভাই ছিলেন বাংলা কাওয়ালি গানের জনকদের একজন।

দিলরুবা আপা গান চারটি দেখে বললেন, ধুর আমি তো এই চারটি গানেরই সুর জানি। নাহিদা আকতার এবং নূরজাহানের প্রায় সব গানই আমার জানা। সেই গাইছে, আমি বাংলা করছি। বলছে, 'আল্লাহু আল্লাহু কিয়া করো' আমি লিখছি 'আল্লাহ আল্লাহু রহম করো'। মাইজভান্ডারি অর্থাৎ দরবারি ধাচের গান হয়ে গেল।

আমিই ছিলাম মেইন। কিন্তু ওদের দুজনের দক্ষতায় আমি হয়ে গেলাম থার্ড। ওরা যা জানে আমি তার কিছুই জানি না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি এরকম দুজন মানুষ পেয়ে গেলাম।

**সাবু :** কেমন হলো?

**মতিউর :** চারটি গানই হিট করল। একেবারে সুপার-ডুপার। ওই সময় আল্লাহু আল্লাহু গান শুনে মাথা নাড়েনি এমন মানুষ কমই ছিল। চারটি গানের জন্য আমাকে ৮০০ টাকা দেয়া হলো। খরচ তো সব সংগীত ঘরের।

**সাবু :** এরপর কি সংগীত ঘরেই থেকে গেলেন?

**মতিউর :** আমি ফিক্সড হয়ে গেলাম। এরপর একে একে ৩২টি ডিস্ক রেকর্ড করি। এর মধ্যে অনেক নামিদামি শিল্পীও ছিল। আমি তখন ঢাকা রেকর্ডিংয়ের পরিচিত প্রডিউসার। অনেকেই কুটি মনসুর, কানাই লাল শীলের কাছে যেতে পারতেন না। আমি তাদের মাধ্যম হতে থাকলাম। তখন আমাকে ঘিরেই একটি বলয় গড়ে উঠল।

**সাবু :** আপনি নিজেও তো প্রডাকশন হাউস খুললেন?

**মতিউর :** সংগীত জগতে আমি তখন পরিচিত নাম। একের পর এক রেকর্ড বের হচ্ছে ঢাকা রেকর্ডিং হাউস থেকে। এর মধ্যে নিজের ভাবনাও অনেক গুছিয়ে ফেললাম। ১৯৮৩ সালে আমি 'চেনা সুর' নামে নিজেই প্রডাকশন হাউস খুললাম।

সালাউদ্দিন সাহেব আমাকে একদিন ডেকে বললেন, তুমি নিজেই প্রডাকশন হাউস খোলো। কারণ তোমার গান ব্যাপক মার্কেট পাচ্ছে। তোমার আর অন্যের হাউসে কাজ করার দরকার নেই।

আমার কোনো ছেলে নেই। তোমাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমি চাই, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অনেক বড় হও। আমি তোমাকে সহায়তা করব। এরপরই অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে 'চেনা সুর' নামে প্রডাকশন হাউস খুললাম।

**সাবু :** এমন নামকরণের সার্থকতা কী?

**মতিউর :** ওই বয়সে মালিক হওয়ার স্বপ্ন মাথায় আসেনি। সালাউদ্দিন সাহেব বলার পরই একটু একটু বুঝতে চেষ্টা করলাম।

আমি ৩০০'র মতো নাম লিখে সালাউদ্দিন সাহেবের কাছে গেলাম। সেখানে সত্য সাহাও বসা। সালাউদ্দিন সাহেব বললেন, সত্য তুমি ওকে দিয়ে ফিল্মের গান লেখাতে পারো। ও ভালো লেখে।

নামের তালিকা সালাউদ্দিন সাহেবের হাতে দিয়ে বললাম, আমার কাছে 'চেনা সুর' ভালো লাগছে। সত্য সাহা তখন জিজ্ঞেস করলেন, কেন ভালো লাগছে? সত্য সাহার প্রোডাকশন হাউস ছিল 'স্বরলিপি'।

আমি বললাম, আমি তো প্রচলিত সুরেই গান লিখি। এ কারণেই আমার প্রতিষ্ঠানের নাম দিতে চাইছি 'চেনা সুর'। যেন কেউ পরবর্তীতে অভিযোগ করতে না পারে যে আমি সুর নকল করেছি। কারণ আমার প্রতিষ্ঠানের নামই হচ্ছে চেনা সুর। আমার সহজ স্বীকারোক্তি।

সত্যদা আমার পিঠের ওপর হাত রেখে সালাউদ্দিন সাহেবকে বললেন, স্যার আপনার এই ছেলে একদিন 'বারুদ' হবে। আপনি যথাযথই আবিষ্কার করেছেন। ও অনেক ভালো করবে। আমি তো নির্বাক।

**সাবু :** নিজের প্রডাকশনে যাত্রা শুরু করলেন?

**মতিউর :** ১৯৮৩-১৯৮৪ সালের মধ্যেই আমি ৩৩টি ডিস্ক রেকর্ড বের করলাম। দিলরুবা খান, পাগল বাচ্চু, মলয় কুমার গাঙ্গলী, মায়া রানী, আবু নওশের, ফারুকী, জমির উদ্দিনের মতো সেরা শিল্পীরা আমার লেখা গানের ক্যাসেট করলেন।

**সাবু :** আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের গানের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই পরিবর্তন আপনি কেমন দেখেছিলেন?

**মতিউর :** তখন বাংলাদেশে পপ সংগীতের জোয়ার। আজম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ, ফকির আলমগীর, জানে আলমরা পপ গানে মাতিয়ে দিচ্ছে। জনপ্রিয় সংগীতে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

**সাবু :** বাউল গান তো হোঁচট খেলো এই সময়ে?

**মতিউর :** বাউল গান ছিল মূলত দরবারি গানের ওপর ভিত্তি করে। রেকর্ডও হতো তা-ই। তবে রেকর্ড হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কারণ একটি ডিস্কে চারটি গানের রেকর্ড হতো। ব্যায়বহুল ছিল। গরিব বাউল শিল্পীরা টাকা পাবে কই?

**সাবু :** তখনও ডিস্ক রেকর্ড?

**মতিউর :** হ্যাঁ, আমি তখনও ডিস্ক রেকর্ড করছি। ১৯৮৪ সালের কোনো এক সময় সালাউদ্দিন স্যার আমাকে ডেকে বললেন, তুমি কি চোখ-কান খোলা রেখে চলো, নাকি অন্ধ থাকো? আমি বললাম, কেন স্যার এ কথা বলছেন?

বললেন, তুমি নতুনের সঙ্গে থাকছ না। রাস্তায় নতুন গান বাজছে, শুনছো। আমি বুঝতে পারছি না। স্যার বললেন, ডিস্ক রেকর্ড আর চলবে না। ক্যাসেটে আসো। টাকা দিয়ে কেউ আর ১৪ মিনিটের গান শুনবে না। ৬০ মিনিটের ক্যাসেটে সবাই মন দিচ্ছে। যা করার দ্রুত করো। এখন বাজার ধরতে না পারলে পিছিয়ে পড়বে।

এরপর পাগল বাচ্চু, মায়া রানীকে দিয়ে নারী-পুরুষের এক ঘণ্টার পালা গান করলাম। আরেকটি ক্যাসেট করলাম বিচ্ছেদ গানের। ৬টা করে মোট ১২টি গান। প্রথম বাজারে ছাড়লাম ক্যাসেটে রেকর্ড করে চেনা সুর-১ নামের অ্যালবামটি।

**সাবু :** বাজার পেলেন?

**মতিউর :** মাত করে ফেললাম। সারা দেশে আমার অ্যালবামের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ক্যাসেট সাপ্লাই দিয়ে কূল পাচ্ছি না। ক্যাসেটে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, তা রেকর্ডিংয়ের ব্যাবসায় বুঝতে পারিনি। যেমন বুঝতে পারিনি অনলাইন বিপ্লবের কথা। আমরা এখনও সিডি নিয়েই বসে আছি। কোটি কোটি লোক অনলাইনে গান শুনছে। আর আমরা ৫০ কপি সিডির ডিস্ক নিয়েই বসে আছি।

**সাবু :** এই সময়ে কোন ধরনের গানে থাকলেন?

**মতিউর :** এই ক্ষেত্রে আমি বিশেষ কৌশলী, তা বলতেই পারেন। আমি জানতাম, কখন গান বাজার পায়। ক্যাসেটে আমি ফোক গানে গুরুত্ব দিলাম। ফোক গান ক্যাসেট করে সারা দেশের মানুষের কাছে 'চেনা সুর' অতি চেনা হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি আমার 'চেনা সুর'র ক্যাসেট না থাকলে দোকানের ব্যবসা হতো না।

ক্যাসেট করার জন্য আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়নি। দোকানদাররা আগে থেকে এসেই বলে যেত, আমার এক হাজার কপি অথবা পাঁচশ কপি লাগবে। তারাই আমার ক্যাসেটের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখতে শুরু করলেন।

ক্যাসেট ভার্সন আসার পর 'চেনা সুর' একেবারে মাটির মানুষের কাছে অতি আপন একটি নাম। গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই আমার প্রডাকশনের ক্যাসেট। এখানেও কপাল খুলল।

**সাবু :** আপনার এমন বিজয় সময়ে ওস্তাদ কুটি মনসুরের অবস্থান কী?

**মতিউর :** তিনি আসলে গানের মানুষ ছিলেন। গানকে ব্যবসার সঙ্গে দেখেননি। আমি জীবনে অমন সরল মানুষ আর দেখিনি। একটি সিগারেটেও কোনো দিন ফুঁ দিতে দেখিনি। সে শুধু আমার গানের গুরু নন, নৈতিকতাও তার কাছ থেকেই শিখেছি। তিনি বলতেন, গান হচ্ছে পবিত্র। এর সঙ্গে ছলচাতুরি করে টিকে থাকা যায় না। যা করো, মন দিয়ে করো। জীবনে কাউকে ঠকাইও না, কারও সঙ্গে প্রতারণা করিও না।

আমি গুরুর কথা যথাযথভাবে রাখার চেষ্টা করেছি। আমি কোনো শিল্পীর গান নিয়ে প্রতারণা করেছি, এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না। আমি নিজেই গান লিখি, সুর করি এবং তা নিয়ে ব্যবসা করি। আমি অন্যের টাকায় কখনও গান করিনি। লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে অ্যালবাম বের করেছি।

ঝুঁকি নিয়ে অ্যালবাম করেছি। তবে আমি ট্রেডিশনাল সুরে থেকেই গান করেছি, যা আগেই বলেছি, আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে 'চেনা সুর'।

অনেকেই অন্যায় করছে। গ্রাম থেকে একটি ছেলে বা মেয়ে লাখ টাকা নিয়ে এসে ধরা খাচ্ছে। অনেক প্রডিউসার ধোঁকা দিয়ে খাচ্ছে। আমি কোনো দিন এই কাজ করেনি। আমি টাকার বিনিময়ে কাজ করেছি। কিন্তু টাকা নিয়ে কাজ করিনি, এমন কথা কেউ কোনো দিন বলতে পারেনি। আজ আমার অনেক হয়েছে। কিন্তু এক সময় কিছুই ছিল না। তখনও আমি এই প্রতারণার আশ্রয় নেইনি।

**সাবু :** এর মধ্যে ব্যাংকে সহায়তাকারী মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আর দেখা হলো না?

**মতিউর :** না। তার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কষ্ট লাগে। শ্যামলীতে বদলি হওয়ার পর আমি আর সদরঘাট ব্রাঞ্চে যাইনি। আর তখন তো আমি পুরোদমে গানের ভুবনে। সময়-সুযোগ কোনোটিই করে উঠতে পারিনি। টেলিফোন নম্বরও ছিল না।

তাকে দেখার খুব স্বাদ জাগে। তিনিও শিক্ষক ছিলেন। দেখা হলে সেলাম করে বলতাম, স্যার আজ আমি খুব ভালো আছি।

**সাবু :** পড়তে ঢাকায় এলেন। করলেন চাকরি। এরপর গানের ভুবনে। বাবা-মা কীভাবে নিলেন?

**মতিউর :** বাবা মারা গেছেন ২০০২ সালে। মা গ্রামেই থাকেন। অন্য ভাইয়েরাও গ্রামে ভালো আছেন। মা গ্রামের মানুষ। আমি কোথায় বিচরণ করছি, সেভাবে বুঝতে পারতেন না। তবে বাবা উৎসাহ জোগাতেন। আগেই বলেছি, রেডিওতে আমার নাম শুনে বাবা আনন্দে কেঁদে ফেলতেন।

১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি। আমি বেতারের গানের গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্তি হই। আমার স্বপ্ন ছিল বেতারের জন্য গান লিখব। তা-ই হলো। গানের বিনিময়ে সম্মানী দেয়া হলো। আমি যখন গীতিকার হই তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন জিয়াউর রহমান। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত রয়্যালিটি দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় এ স্বীকৃতিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

সব শিল্পীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠল। বশির আহমেদ সাহেব, এ এইচ এম রফিক, খবির উদ্দিন, খন্দকার নুরুল আলম সাহেবের মতো মতো বড় বড় শিল্পীর সুরে গান করতে পারলাম। এখানেও আমি অনেক ভালো করলাম। এর আগে টেলিভিশনের জন্যও গান লিখলাম।

**সাবু :** ওই সময়ের কোনো গান...

**মতিউর :** অনেক গানই তখন জনপ্রিয় হয়। এর মধ্যে একটি গান ছিল ' ফরিক লালন কয়া গেলা না।' গানটি সুর করেছিলেন অনুপ ভট্টাচার্য আর গেয়েছিলেন মলয় গাঙ্গলী।

ঢাকা ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসেস ছিল বেস্ট রেকর্ডিং, সেখানে সপ্তাহে একটি বা দুটি মাত্র গান রেকর্ড হতো। সেখানে এই গানটি রেকর্ড করা হয়।

**সাবু :** গান নিয়ে ব্যবসা করছেন। খেলা করছেন। এখনও খেলছেন। আপনার জীবনে গান নিয়ে খেলা করার মোক্ষম সময় কোনটি?

**মতিউর :** ১৯৮৭ সাল। গানের ভুবনে আমার জীবনের সবচেয়ে টার্নিং পয়েন্ট। এই সময়ে বাংলাদেশে ভারতীয় গজলের বিপ্লব ঘটে যায়। আর এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা রাখে পঙ্কজ উদাসের গজল। হাটে, ঘাটে, বিয়ে, খাৎনাসহ সব অনুষ্ঠানেই পঙ্কজের গান মাত করে দিচ্ছে। সবার ঠোঁটেই পঙ্কজের সুর। বাড়িতে টেপ রেকর্ডার আছে কিন্তু পঙ্কজের ক্যাসেট নাই, তা হতে পারে না। লাখ লাখ অ্যালবাম বিক্রি হতে থাকল দোকানে।

রাস্তায় চলতে চলতেই মানুষের মধ্যকার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকলাম। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এটি কীভাবে সম্ভব?
এর আগে আমরাও অ্যালবাম বের করে বিপ্লব ঘটিয়েছি, কিন্তু এভাবে সাড়া মেলেনি। ফিডব্যাক, সোলস অনেক আগেই ভালো করছে। পপ যুগের পর ব্যান্ড যুগ শুরু হলে অনেকেই ভালো করলেন। কিন্তু পঙ্কজের কাছে সবাই মার খেয়ে যাচ্ছে।

**সাবু :** একটু থামিয়ে বলছি। পপ, ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে তো মানুষের মননের রূপান্তর ঘটল। এই সময় বাউল গান লিখে কতটুকু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে আপনাদের?

**মতিউর :** অনেক চ্যালেঞ্জের সময় সেটি। আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, এই রূপান্তর। ব্যান্ডের ভিড়ে, একক শিল্পীরা সমস্যায় পড়লেন। তখন বাউল গানের নেতৃত্বে আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান 'চেনা সুর'। এ কারণে আমাকেই বেশি সমস্যায় পড়তে হলো।
এই সময় আমাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হলো। বেবি নাজনীন, মনির চৌধুরী, এস ডি রুবেল, কুমার বিশ্বজিৎ, খালিদ হাসান মিলু, শুভ্র দেব, তপন চৌধুরীর মতো শিল্পীদের নিয়ে আমাদের ভাবতে হলো। এরা সবাই মডার্ন বেইস শিল্পী। এ কারণে ফোক গানের শিল্পীর অভাব দেখা দিলো। তখনও মমতাজদের মতো বাউল শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেনি। একেবারে ফোক গান গায় যারা, তারা ক্যাসেটের ব্যবসা থেকে দূরে সরে গেলেন। যেমন ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, মিনা বড়ুয়া, নীনা হামিদ, বিপুল ভট্টাচার্য, মলয় কুমার গাঙ্গুলীরা পিছিয়ে পড়ল। 'আমার গলার হার খুলে নে' বিখ্যাত গানের শিল্পী কানন বালা সরকারও উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সে ছিল ফোক গানের রানী।
মডার্ন যন্ত্রপাতির ধাক্কায় ফোক গানের শিল্পীরা দিশেহারা। পশ্চিমা মিউজিকে মানিয়ে উঠতে পারল না। ঢোল, তবলা, দোতরা, বাঁশির জায়গায় প্যাড, কিবোর্ডের মতো ভারী যন্ত্র এসে বড় ধাক্কা মারল। ফোক বেইস শিল্পীদের নিয়ে বিনিয়োগের অভাব দেখা দিল। আবার কেউ কেউ হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করল। কেউ কেউ মনে করল, আমার দেশীয় যন্ত্রের বাইরে ভিনদেশি যন্ত্রে গান করব না। দ্বিধায় ভুগতে শুরু করলেন ফোক শিল্পীরা।

**সাবু :** এই দ্বিধার যৌক্তিকতাও ছিল?

**মতিউর :** ছিল। সেটা আবেগের। আমি আবেগকে খাটো করে দেখছি না। কিন্তু বাস্তবতার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে তো চিরতরে হারিয়ে যাব।
আমি যদি গানের ভাষা, সুর, তাল, লয় ঠিক রেখে আধুনিক যন্ত্রে গান করতে পারি, তাহলে বাংলার ফোক গান বিশ্বমানেরও হতে পারে। শ্রোতা যা চায়, তাই তো আগে গুরুত্ব দিতে হবে।
আমি রকেটের গতি ছেড়ে তো ঠেলাগাড়ির গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারি না। যে শিল্পীদের নাম উল্লেখ করেছি তারা মডার্ন গানে বাজার দখল করে ফেলল। ফোক গানের ক্যাসেট হয় না বললেই চলে।

**সাবু :** কৌশলের কথা বলছিলেন?

**মতিউর :** কৌশলের পরিবর্তে আমি ওই সময়ের ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। আমাদের ষড়যন্ত্র ছিল অথচ সুস্থ।
টাকা বেশি দিয়ে মডার্ন শিল্পীদের প্রস্তাব করলাম। কৌশলে আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়েই তাদের কণ্ঠে ফোক গান তুলে দিতে থাকলাম। এর মধ্য দিয়ে তারাও ভিন্ন স্বাদ পেতে থাকলেন। তারা সবাই এককভাবে গান করতে অভ্যস্ত। আমরা সেভাবেই কৌশল নিলাম। হয়ত কুমার বিশ্বজিৎকে বললাম, আমার চারটি গান করে দিতে হবে। আবার বেবী নাজনীনকে বললাম, আপা আমার তিনটি গান করে দেন। এভাবে চারজন শিল্পীর গান নিয়ে একটি মিক্সড অ্যালবাম করতে থাকলাম। বলতে পারেন, টাকা দিয়ে ফোক গান টিকে রাখার কৌশল।
একই অ্যালবামের চারজন, পাঁচজন শিল্পীর ছবি। শিল্পীরা প্রথমে জানছে না এই কৌশলের কথা। অ্যালবামের নাম দিচ্ছি 'তোমার আমার ভালোবাসা'। অ্যালবামের নাম, আর একাধিক শিল্পীর ছবি দেখে শ্রোতারা পাগল হয়ে গেল। একেবারে লুফে নিল। এই ধারার শুরু আশির দশরের শেষের দিকে। আর স্বর্ণযুগ ছিল ২০০০ সাল পর্যন্ত। অডিওর যুগ এটি। ২০০০ সালের পর তো সিডির যুগ শুরু হয়ে গেল।

**সাবু :** তার মানে কৌশলে সফল?

**মতিউর :** হ্যাঁ, আজকে ফোক গানের যে জনপ্রিয়তা, তার পেছনে ওই সময়ের কৌশল অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আধুনিক গানের শিল্পীরা, আধুনিক মিউজিকে ফোক গাইছে, শ্রোতারা শুনে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। একটি মঞ্চে আধুনিক গান গেয়ে দর্শক-শ্রোতার যে সাড়া মেলে তার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া মেলে একটি ফোক গানে। আধুনিক গানের একক অ্যালবাম করলেই মার খেয়ে যায়। আর ফোক গানের মিক্সড ক্যাসেট করলেই হিট।

**সাবু :** কিন্তু একক গানেও তো কেউ কেউ হিট করেছে?

**মতিউর :** সংখ্যায় খুবই কম। ব্যতিক্রম শুধু আসিফ আকবর। আসিফ আকবর একক অ্যালবাম করেই সুপার হিট করল। ওই রকম হিট তো মমতাজরাও করল এবং সেটা ফোক গানেই।
আমরা ওই সময় বুদ্ধিভিত্তিক কৌশলের আশ্রয় না নিলে ফোক গানের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।

**সাবু :** এই কৌশলে নীনা হামিদ, কানন বালার মতো গুণী ফোক শিল্পীদের ফেরাতে পারলেন না কেন?

**মতিউর :** এখানে বয়স একটি ফ্যক্টর ছিল। নীনা হামিদ পাকিস্তান আমলের শিল্পী। সে ১৯৬৪ সালের দিকে 'রূপবান' ছবিতে গান গেয়েছে। আব্দুল আলীমের সঙ্গে গান করেছেন। কানন বালা সরকারও সেই সময়ের শিল্পী। তারা আধুনিক যন্ত্রে তাল মেলাতে চাননি।
অন্যদিকে তরুণরা অডিও ক্যাসেটে অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদের গান শুনতেই অভ্যস্ত হতে থাকল। নীনা হামিদরা হালকা গান করতে চাইতেন না। আমি মমতাজকে দিয়ে একটি হালকা গান করে হিট করতে পারি, কিন্তু কানন বালাকে দিয়ে তা পারতাম না। 'একটি বোরকা পরা মেয়ে আমায় পাগল করেছে' এই গান আমি ইন্দ্রমোহন রাজবংশীকে দিয়ে করাতে পারব না। 'বুকটা ফাইট্যা যায়' এই গানটি কানন বালা সরকার দশ কোটি টাকার বিনিময়েও করবেন না। এ কারণেই তাদের পিছিয়ে পড়া।
নতুন সময়, নতুন ভাবনায় নতুন গান। শিল্পীও নতুন। তবে গুণীরা পিছিয়ে আছে প্রচারে, গানের মর্যাদায় নয়।

**সাবু :** আপনার সফল আবিষ্কার ফোক শিল্পী মুজিব পরদেশী, যিনি আশির দশকে বিচ্ছেদ, বাউল গানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুজিব পরদেশীকে কখন, কীভাবে আবিষ্কার করলেন?

**মতিউর :** বলছিলাম, পঙ্কজ উদাসের গজলের কথা। সারাদেশে পঙ্কজে মেতে উঠছে। তার গানে যান্ত্রিক কোনো অত্যাচার নেই। চরম মাদকতা আছে। একটি হারমোনিয়াম, একটি মন্দিরা এবং একটি তবলা দিয়েই গলাটাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। সবাই প্রাণ দিয়ে শুনছেন। তার গান নিয়ে ভাবছি, গবেষণা করছি। দেখলাম, গানকে অস্থির করার চাইতে স্থির করতে পারলেই মানুষ খায় বেশি। ফালাফালি করার চাইতে বসিয়ে গান শোনাতে পারাটাই সার্থকতা। ফালাফালির যুগ তখনও আসেনি।
পঙ্কজের গান শুনে দিল ফেটে যাচ্ছে। 'নিকলো না বে-নেকাব, দুনিয়া খারাপ হে' আহারে! কি গান? বলছেন, দুনিয়া খারাপ হয়ে গেছে, তাই পর্দা ছাড়া তুমি বাইরে যেয়ো না।' পর্দা ছাড়া বাইরে এলে অন্য লোকের দৃষ্টি পড়বে, তাতে আমার কষ্ট বাড়বে। সুন্দরী ভালোবাসার মানুষটির প্রতি এমন আকুতি সবাইকে নাড়া দেয়। অল্প কথায়, এমন চমৎকার ভাব আর কোনোভাবেই যেন প্রকাশ করা যায় না। রোমান্টিকতায় ভরপুর, অথচ কি ট্র্যাজেডিক।
গজলে মূলত ধর্মীয় গানের সুর আঙ্গিকে হয়ে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ তার সুরে প্রেমের গানকে ইবাদতের জায়গায় নিয়ে গেছে। এই কারণেই পঙ্কজের প্রেমের গান গজলে খ্যাতি পেল।
এরপর থেকেই মনের ভেতর একটি বাংলা গজলের ক্যাসেট নিয়ে খুঁতখুঁতানি শুরু হলো। কীভাবে এই সুরে গজল করা যায়, তাই শুধু ভাবতে থাকলাম।
গানগুলো মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি। খুঁজছি শিল্পী। রথীন্দ্রনাথের মতো বড় বড় ফোক শিল্পীরা তখন আমার অতি কাছের মানুষ। কিন্তু তাদের নিয়েও ভাবতে পারছি না। আমার ঠাণ্ডা সুরের মানুষ লাগবে। অনেক খোঁজার পর পেলাম মুজিব পরদেশীকে।
সাবু : তাকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন?
মতিউর : ১৯৮৬ সালরে ঘটনা। ঘরোয়া পরিবেশে শিল্পী আব্দুল আলীমের বাসায় মুজিব পরদেশীর কণ্ঠে একদিন গান শুনলাম। সে আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড় হবে। শুনেছি, আব্দুল আলীমের সঙ্গে যোগালী

হিসেবে থাকতেন। যন্ত্রপাতি টানাটানি করতেন। ওই দিন তার কণ্ঠ খুব যে আমুদে মনে হয়েছে, তা-ও নয়।

আমি মনে মনে শিল্পী খুঁজতে অস্থির। মেলাতে পারছি না। মুজিব পরদেশীর কথা মনে পড়ল। ওর নাম তখন মুজিবর রহমান মোল্লা।

আমি বেহালা বাদক আলমাস ভাইকে মুজিব সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। আলমাস ভাই বললেন, ও সদরঘাটের বিপরীতে কালীগঞ্জের জিঞ্জিরায় থাকে। আমি নৌকা দিয়ে ওপারে গেলাম। সেখানে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন, 'মুজিব তার বাবার সঙ্গে ওয়াইজ ঘাটে ফলের ব্যবসা করে। ওখানে গিয়ে ইউসুফ আলী মোল্লার দোকানের কথা জিগাইলেই দেখাইয়া দেবে।' আবার এপারে এসে ওয়াইজ ঘাটে গেলাম। দোকান পেলাম।

ওর বাবা বলল, মুজিব এখন নেই। হোটেলে থাকে। হোটেল মাসনবীতে গিয়ে খোঁজ নেন। ওখানে গিয়ে খোঁজ নেন। পরে জানতে পারলাম, মাসের পর মাস ওই হোটেলেই কাটিয়ে দিচ্ছে। হোটেলে গিয়ে দেখি, সে নাই। আমি একটি টোকেন ধরিয়ে দিয়ে হোটেল ম্যানাজারকে বললাম, আমি কাল আবারও আসব।

পাটুয়াটুলিতেই তখন আমার কারবার। ওয়াইজ ঘাটের পাশেই পাটুয়াটুলি। পরের দিন হোটেলে গিয়ে ৩১ নং রুমে তার সাক্ষাৎ পেলাম।

**সাবু :** হোটেলে থাকার রহস্য কী?

**মতিউর :** এ ব্যাপারে মজার কথা শোনালেন মুজিব ভাই। বললেন, হাসান ভাই শোনেন। আমি একা ঢাকায় থাকি। বউ থাকে মুন্সীগঞ্জে। একা বাড়ি ভাড়া নিলে যে টাকা ব্যয় হবে, তার চেয়ে একটু বেশি খরচে আমি হোটেলে থাকতে পারছি। বাসা নিলে বউ লাগবে, কাজের মেয়ে লাগবে, নিয়ম মেনে চলতে হবে। এখানে নিয়মের বালাই নাই। দশ টাকা দিলে হোটলে সারাদিন সার্ভিস দেবে। যে যখন খুশি এসে দেখা করতে পারছে। বাড়িওয়ালার এই অত্যাচার সয় না। হোটেলে আমি জমিদার। স্বাধীনভাবে চলতে পারছি। কোনো চিন্তা নাই।

এমন ভঙ্গিতে বলছে, শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম আসলে তো তাই। আজব লোকের আজব চিন্তা। আমিও জীবনের একটা শিক্ষা পেলাম। কোথাও বেড়াতে গিয়ে হোটেলে থাকার শিক্ষা নিলাম মুজিব পরদেশীকে দেখেই। কলকাতায় অনেক আত্মীয় আছে। কিন্তু আমি গিয়ে হোটেলেই উঠি। সময় করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করি। কারও বিরক্তির কারণ হই না।

**সাবু :** পরে কী কথা হলো?

**মতিউর :** সে তো আমারে দেইখ্যা অবাক হইলো। কারণ তার কাছে আমি তখন অনেক বড় গীতিকার। আমার ব্যাপারে সবই জানে। দিলরুবা খান, মায়া রানীরা আমার গানে তখন বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কথা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে। কিন্তু আমি তখনও আসল কথাটা বলছি না। ও নিজেই আমার নানা গান নিয়ে কথা বলছে। চুপচাপ শুনছি। একপর্যায়ে অনুরোধ করে বলছে, ভাই আমার একটা ক্যাসেট করার খুবই শখ। আপনে যদি দয়া করে সহযোগিতা করতেন।

আমি তো ওর এই কথা শোনার অপেক্ষায়ই ছিলাম। আমি চাইছিলাম, ও নিজে থেকেই বলুক। কারণ শিল্পীদের এ ক্ষেত্রে স্বভাব খারাপ। আমি যদি আগ বাড়িয়ে বলি, তাহলে বাউলি মারতে পারে। ক্যাসেটের কথা যদি বলি, তাহলে বলবে, না ভাই। আমার কণ্ঠ ভালো না। এরপর দরদাম নিয়ে কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি জানি, আমার কাছে তাকে এমন অনুরোধ করতেই হবে। তখন আমিই প্রডিউসারদের মধ্যে সেরা। তখনও সাউন্ডটেকের জন্ম হয়নি। সঙ্গীতাও অন্যের প্রডাক্ট বিক্রি করে বাজার পাচ্ছে। মুজিব তো আমাকে চেনে।

আমি বললাম, মুজিব ভাই ক্যাসেট করলে কিন্তু আমার কথামতো করতে হবে। আপনে মাতব্বরি করলে ক্যাসেট হবে না। তখন বলছে, ভাই কন কী আপনে? যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই হবে। আপনার কথাতেই সব অইবো।

আমার উদ্দেশ্য ওকে দিয়ে পঙ্কজ উদাসের ঢংয়ে গান করানো। আমি বললাম, কাল আবার আসব। পরের দিন গিয়ে হারমনোয়িমে গান তুলে দিলাম। সে তখন অনেক সুন্দর হারমোনিয়াম বাজায়।

**সাবু :** তার কোনো কথাই থাকছে না?

**মতিউর :** না। সে বলছে, অমুকে তবলা, অমুকে বাঁশি, অমুকে দোতরা বাজাবে। আমি বললাম, আপনার কোনো কথা আমি শুনব না। বললাম, আমার ইচ্ছামতো হবে। একটি হারমোনিয়াম, একটি তবলা এবং একটি মন্দিরা থাকবে। আর কোনো কিছু থাকবে না। একুস্টিক গিটার রাখতে চেয়েছিলাম। পরে তা-ও বাদ দিলাম। আমার এই কাজটি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে।

মুজিব মন খারাপ করল। বলছে, জীবনের প্রথম ক্যাসেট এভাবে হয়? সে ৫ হাজার টাকা দিতে চেয়ে বলল, আপনি এই এই যন্ত্র নেন, আমি খরচ দেব। আমি বললাম, আমার একটি ক্যাসেটে ৫০ হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ আছে। কিন্তু আমি তা করব না। আমি যে চিন্তা থেকে করছি, হয় ফ্লপ, নয় বিপ্লব। মাঝামাঝির কোনো সুযোগ নাই। ও কষ্ট পেল। পাওয়াই স্বাভবিক। আমার খেলা, কিন্তু ওর তো প্রথম।

**সাবু :** হারমোনিয়াম কে বাজাল?

**মতিউর :** আমি মুজিবরে কইলাম, হারমোনিয়াম বাজাবে নকুল কুমার বিশ্বাস। দুর্দান্ত বাজায় নকুল।

ওকে নিয়েই নকুলের কাছে গেলাম। নকুল কইল, মতি ভাই, এত আমার বিরাট সুযোগ। কথা ঠিক করে চইল্যা আইলাম। রাস্তায় মুজিব ফের আপত্তি তুলল। কইলো, মতি ভাই আপনি যা চাইছেন, তা নকুল ভাই পারবে না। সে তো ক্লাসিক্যাল বেইজড। মডার্ন সুর করে। গজলের সুরে...

ভিন্ন কিছুই যদি করেন, তাহেলে ফোককে গুরুত্ব দিয়েই করেন। হারমোনিয়ামের সুর শুনে যেন মানুষ মাতাল হয়ে যায়।

**সাবু :** এর পর কী করলেন?

**মতিউর :** সে কইল, আমাকে এক সপ্তাহ সময় দেন। দিলাম। হোটেলের দরজা বন্ধ করে সপ্তাহ ধরে হারমোনিয়ামে গানগুলো তুলল। বিপ্লব ঘটিয়েছে। পঙ্কজ উদাসকে অনুকরণ করে বাংলা গানের সুর।

নিজে নিজে রিহার্সেল করে আমাকে শোনাতে এসেছে। শুইন্যা আমি তো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হায় হায় করছে কি! এমন সুর হতে পারে!

তখন আমি মুজিবরে কইলাম, এই হারমোনিয়াম চলবে না। এই হারমোনিয়ামে পঙ্কজ গান করেছে। অনেক দামি হারমনোয়িাম। তা হবে না। অল্প দামের হারমোনিয়াম লাগবে।

**সাবু :** করছেন তো পঙ্কজের অনুকরণ। হারমোনিয়াম তো তা-ই হবার কথা?

**মতিউর :** এটি করলে মহা ভুল হয়ে যেত। আমি তো একুস্টিক গিটারও নিইনি। পঙ্কজ নিয়েছে। ভিন্ন কিছু করাই তো আমার উদ্দেশ্য।

এরপর আমি ওকে নিয়ে শাঁখারীপট্টিতে গেলাম। তখন শাঁখারী পট্টিতে সব ধরনের যন্ত্রই ভাড়া পাওয়া যেত। তখন তো ঘরে ঘরে যন্ত্র ছিল না। অনেকগুলো দোকানে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শুনলাম। পছন্দ হয় না। ঘুরতে ঘুরতে একটি হারমোনিয়াম পছন্দ হয়ে গেল। সারাদিনের জন্য হারমোনিয়ামটি ৭০ টাকা দিয়ে ভাড়া নিলাম। সন্ধ্যার পর ঝংকার স্টুডিওতে ঢুকলাম। সাউন্ড, যন্ত্র মিলিয়ে নিয়ে হারমোনিয়ামে মুজিব যখন টান দিলেন, মনে হলো গোট স্টুডিও কেঁপে উঠছে। সাধারণত যাত্রায় এসব হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

মন্দিরা বাজালেন নিজাম নামের একজন। সে-ও প্রথম রেকর্ডিংয়ে। চন্দনা মজুমদারের বাড়িতে থাকতেন। ওর বাড়ি ছিল রাজবাড়ী। আমরা নিজাম মামু বইলা ডাকতাম। ফ্রি বাজালেন। সজল বাজাল তবলা। ও শিল্পকলা একাডেমিতে তখন ঘোরাঘুরি করে। কেউ বাজাতে বললে বাজায়। দুজনই সৌখিন লোক। রেকর্ডিংয়ে ওদের তিনজনের জন্যই প্রথম এবং তিনজনই আনাড়ি।

এ কারণেই 'আমি বন্দী কারাগারে' অ্যালবামটি বাংলাদেশের সংগীত জগতের জন্য একটি ইতিহাস বলে মনে করি।

এক দমে পাঁচটি গান শেষ। পরের দমে আরও ছয়টি। ১১টি গানে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের রেকর্ড শেষ করলাম। হোসেন আলী রেকর্ডিস্ট, আমি পাশে বসা।

আমার দেরি সইছে না। মানিব্যাগ থেকে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিল মুজিব। ছবি নিয়ে শাঁখারী বাজারে গিয়া ডিজাইন কইর্যা, ছবির ওপর লিখলাম, 'আমি বন্দী কারাগারে'।

**সাবু :** 'আমি বন্দী কারাগারে' মুক্তি দিলেন?

**মতিউর :** ক্যাসেট রেকর্ড করে নবাবপুর আফসার ভাইয়ের দোকানে ২০টি কপি দিয়ে আসলাম। সে ছিল আমার কোম্পানির ডিলার।

কমলাপুর থেকে আরেক দোকানদার আফসার ভাইয়ের কাছে ক্যাসেটের জন্য এসেছে। আফসার ভাই কচ্ছেন, নতুন শিল্পী মুজিব পরদেশীর নতুন ক্যাসেট আইছে। দুইটা কপি নিয়া যাও। হেয় কইতেছে, নতুন শিল্পীর ক্যাসেট তো চলে না। এর মধ্যে আবার মুজিব পরদেশী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ক্যাসেট নাকি? বঙ্গবন্ধু পরদেশে চইল্যা গেছে। হেরে নিয়া গান নাকি। আফসার ভাই জোর করে দুটি ক্যাসেট দিয়েছে। আফসার ভাই তখনও ক্যাসেটটি শোনেননি।

ওই লোক দোকানে নিয়া ক্যাসেট ছেড়েছে। আর কোথায় যায়? 'বন্দী কারাগারে' গানটি শেষ না হতেই দুইজন ক্যাসেট দুটি কিনে নিয়া চইল্যা গেছে। শ্রোতা-ক্রেতার দীর্ঘ লাইন। দোকানদারও আর বাজাতে পারছে না। দোকানদার ফের দৌড় ক্যাসেটের জন্য। তখন আর পাঁচটি ক্যাসেট ছিল আফসার ভাইয়ের কাছে।

এরপর আফসার ভাই পাগলের মতো আমাকে খুঁজতেছে। ১৯৮৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর রেকর্ড করেছি। ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি বাজারে ছেড়েছি ক্যাসেটটি।

আফসার ভাই বাসায় লোক পাঠিয়েছে। বলছে, পাঁচশ নয়, হাজার নয় যত পারেন, কপি দেন। গুনে দিতে পারছি না। শত শত ক্যাসেট ঘণ্টায় বিক্রি হচ্ছে। আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট এটিই।

টুকটাক করে চলছিলাম। এবার আর্থিকভাবে জীবনের মোড় ঘুরে গেল। মুজিব পরদেশী সংগীত জগতের 'অন্য এক বাংলাদেশ'। সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠান 'চোনা সুর'। পঙ্কজ উদাস উধাও। পঙ্কজের জায়গায় মুজিব।

একবার ইত্যাদিতে হানিফ সংকেত নির্বাচিত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাশাপাশি ৬০টি হোটেলে একই সময় একই শিল্পীর গান বাজছে, সেই অ্যালবামটির নাম কী হতে পারে? জবাব দিলো, 'আমি বন্দী কারাগারে'। মিরাক্কেল ঘটনা। একেক হোটেলে একেক গান। কিন্তু একই অ্যালবামের।

**সাবু :** কত সংখ্যা বিক্রি হয়েছিল?

**মতিউর :** ৬০ লাখ কপি আমার চেনা সুরের মধ্য দিয়ে বিক্রি হয়েছে। একই ক্যাসেট একশ বারও কেউ কেউ কিনেছে। সংগীতপ্রেমীদের জন্য এটি ছিল অপরিহার্য। ঘরে টেপ রেকর্ডার থাকলে পরদেশীর 'বন্দী কারাগার' অ্যালবাম নেই, তা হতে পারে না।

এখনও বিক্রি করছি। সিডিতে রূপান্তর করে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। অনেকেই আমার কাছে শিল্পী নিয়ে আসে। এসে বলে, ভাই ও ভালো করে। বলে, অনেকটাই মুজিব পরদেশীর মতো। মুজিব পরদেশী একটি জীবন্ত উদাহরণ হয়ে গেল। এখন যেমন অনেকেই মেয়ে শিল্পী নিয়ে এসে বলে, ভাই ওর কণ্ঠে জাদু আছে, হুবুহু মমতাজের মতো গায়।

**সাবু :** এত বড় শিল্পী বানালেন, অথচ হারিয়ে গেল। অ্যালবামের শিরোনামের সার্থকতা, মুজিব পরদেশী নিজেকে দিয়েই প্রমাণ করলেন। একাধিকবার জেলে বন্দী হলেন। এখনও ফেরারি। আসলে কী ঘটেছিল পরদেশীর জীবনে?

**মতিউর :** দেখবেন, সমাজে কেউ যখন অতি বড় হয়ে যায়, মাফিয়া বা কুচক্রী মহল তার পিছু নেয়। সেলেব্রেরিটিরা এই সমস্যায় বেশি পড়ে। পুলিশ, প্রশাসনও তাদেরকে ছাড় দিতে থাকে। এয়ারপোর্টে মমতাজের ব্যাগ চেক করার কথা নয়।

এর ব্যতিক্রম পরদেশীর জীবনেও ছিল না। এমন ঘটনা শোনা গেছে, পরদেশীকে যিনি চেনেন তাকে মাছও বাকি দেয়া যায়। সারা দেশে এক নামের শিল্পী, যারা আমাকে চিনত, তারা পরদেশীর কারণে আমাকে জোর করে সদাই দিত।

'বিধি কলমে কি নাই কালিরে', 'আমার সাদা দিলে কাদা লাগাই গেলি' 'আমি কেমন করে পত্র লিখিরে বন্ধু,' শিরোনামের গানগুলো শুনে যত বড় সফল মানুষই হোক, তার জীবনের না পাওয়ার কথা মনে পড়ে যেত। সে কি জনপ্রিয়তা! একবার লঞ্চে আমাকে চিনতে পেরে কথা বলার জন্য, এক নজর দেখার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পেছনের মানুষ হিসেবে আমারই যদি এই অবস্থা হয়, যে সামনের মানুষ তার অবস্থা কী? আমার লঞ্চে অনেক সময় ভাড়া নেয়নি। জোর করেও দিতে পারিনি।

পরদেশীর এমন জনপ্রিয়তা দেখে এক মাফিয়া চক্র কৌশলে তাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। সম্ভবত ১৯৮৮ সাল হবে। ২ মাসের ভিসায় ইংল্যান্ড চলে গেল পরদেশী। কৌশলে ভিসার মেয়াদ শেষ করে দেয় মাফিয়া চক্রটি। ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলে দীর্ঘ চার বছর তাকে আটকিয়ে রাখা হলো। ইংল্যান্ডের একটি স্কুলে সংগীত বিভাগে ছোটখাটো চাকরিও করেছিলেন।

ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও মাখামাখি ছিল বলে ওকে নিয়ে এত কথা।

এরপরের ইতিহাস ভিন্ন। মাফিয়া চক্র এক সময় বলল, মুজিব ভাই আপনি তো দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। আপনি আর আমরা মিলে আদম ব্যবসা শুরু করি। বলল, দেশে গিয়ে ইউরোপের দেশগুলোতে লোক পাঠানো শুরু করেন। প্রথমে আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজনকে টার্গেট করেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে ৭ লাখ করে টাকা নিবেন। আমারা নেব ৫ লাখ আর আপনি পাবেন ২ লাখ। বছরে ৫০ জন লোক পাঠাতে পারলে এক কোটি টাকা আপনার থাকবে। ১০০ জন পাঠলে পাবেন ২ কোটি টাকা। আপনার গান-বাজনা কিছুই করতে হবে না। সারা জীবন বসে বসে কাটিয়ে দিবেন।

মাফিয়াদের প্রস্তাব লুফে নিল সে। দেশে এসে আত্মীয়স্বজন যার কাছ থেকে যেমন পারে, সেভাবেই টাকা নিয়ে লোক পাঠানোর কথা বলল। চার বছর ইংল্যান্ডে থেকে এসেছে। সবাই পরদেশীরে টাকা দিয়ে বিশ্বাস পাচ্ছে। পরদেশী মানেই বিশাল কিছু। ভাই, চাচা, শালা, মামা এমন কোনো পরিচিত জন নেই, যে পরিবার থেকে পরদেশী টাকা নেয়নি। মাসে দুই লাখ, তিন লাখ টাকা বেতনের কথা শুনে সবাই অস্থির।

লাখ লাখ টাকা তুলে কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে শুরু করলো। বিদেশ যাওয়ার তালিকায় আব্দুর রহমান বয়াতির মতো ব্যক্তিরাও ছিল।

ফতুর। একেবারে ফতুর। সিলেটের একজন মাফিয়া মুজিব পরদেশীর কাছ থেকে সমস্ত টাকা নিয়ে লন্ডন চলে গেছে। মুজিব পরদেশীর নিজের পাসপোর্টও নেই, ভিসাও নেই।

সমস্ত টাকা দিয়ে পরদেশীও উধাও। সবাই খুঁজতে শুরু করলো। কয়েক মাস পর বাড়িতে গেলে সবাই ঘিরে ধরতে শুরু করল। কূল না পেয়ে সবাই একজোট হয়ে পরদেশীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করে দিল।

> লেখার জগতে প্রেম-বিচ্ছেদের ঘটনা আমার জীবনে উল্টো ঘটছে। মানুষের জীবনে আগে প্রেম আসে, পরে বিচ্ছেদ। আর আমার সংগীত জীবনে বিচ্ছেদ আগে এসেছে, পরে প্রেম। পরদেশীরে দিয়া গাওয়াইছি, 'আমি কেমন করে পত্র লিখিরে, গ্রাম পোস্ট অফিস নাই জানা, তোমায় আমি হইলাম অচেনা'। কড়া বিচ্ছেদ। এ গান শুনলেই প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। আর আশরাফরে দিয়ে গাওয়াইলাম, 'পুকুরেতে পানি নাই পাতা তবু ভাসে, যার সনে যার দেখা নাই সে কেন হাসে রে'। প্রেম জাগিয়ে তোলার গান। ছন্দে ছন্দে রোমান্স। এ গান শুনে সবাই যেন প্রেম বনে যেতে চাইছে

এর পর আত্মগোপনে। একজন ভালো মানুষ, মাটির মানুষ প্রতারকদের ফাঁদে পরে জীবন থেকে জীবন হারিয়ে ফেলল। গান গেয়ে বহু মানুষকে কাঁদিয়েছে সে। অথচ তার জীবনেই কান্না চিরসঙ্গী হয়ে গেল।

**সাবু :** তার হারিয়ে যাওয়া আপনার মনে কতটুকু দাগ কাটল?

**মতিউর :** এমন একজন সঙ্গীর হারিয়ে যাওয়া কেউ মেনে নিতে পারে না। আফসোস ছাড়া কিছুই করার ছিল না। তখন সে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ। আমি একা কষ্ট পাইনি। আমার মতো কোটি কোটি ভক্ত কষ্ট পেয়েছেন।

**সাবু :** মামলার কী হলো?

**মতিউর :** প্রতারণার মামলায় অনেক দিন জেল খেটেছেন। পরে জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু হাজিরা না দেওয়ার কারণে অনেক আগেই তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। এখনও আত্মগোপনে। কোথায় আছে, কেমন আছে, তা জানার সুযোগ নেই। তবে মাঝে মাঝে ঘরোয়া পরিবেশে পালিয়ে পালিয়ে প্রোগ্রাম করেন বলে জানতে পারি। এমন একজন শিল্পিকে হারিয়ে বড় কষ্ট হয়।

**সাবু :** আপনারাও তো যোগাযোগ করতে পারতেন?

**মতিউর :** লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর আমি তার সঙ্গে কাজ করেছি। 'ভাব বৈঠকী' নামের আরেকটি অ্যালবাম করেছিলাম। এটিই তার সঙ্গে আমার শেষ অ্যালবাম। দেশে থাকতে তাকে দিয়ে আরও ছয়টি অ্যালবাম করি। তবে পরের কোনোটিই আর আগেরটির মতো হিট করতে পারেনি।

**সাবু :** হিট না করার কারণ কী?

**মতিউর :** আগেরটির মতো মনোযোগী হয়ে করতে পারিনি। পরের গানগুলোও যে খুব ভালো লিখেছিলাম, তা-ও বলা যাবে না। ওর জীবনেও নানা অস্থিরতা চলে আসল। প্রথমটির মতো আবেগ দিয়ে কাজ করতে পারিনি। নানা কারণেই পরেরগুলো আর আগেরটির মতো হয়নি। তবে ব্যবসা হয়েছিল বেশ।

হ্যাঁ, অনেকেই তাকে নিয়ে অ্যালবাম করেছিল। বাজারে বেশ কিছু ক্যাসেট আছে তার।

তবে আমি তাকে যেভাবে আবিষ্কার করেছিলাম, অন্যরা ঠিক সেভাবে পায়নি। এর কারণ হচ্ছে, আমি তার কণ্ঠের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান লিখতাম। আমার আবেগ এবং তার সুর দুইয়ে মিলে একাকার। আমি তো শুধু ব্যবসায়ী নই। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি একজন লেখক, গীতিকার এবং সুরকার। আমি জানতাম, মানুষ কী চায়। মানুষের চাহিদা বুঝতে পারলে ব্যবসা এমনিতেই হয়। তখন অর্থের জন্য আলাদা করে ভাবতে হয় না।

আমি যদি আর কিছুদিন তাকে পেতাম, তাহলে আরও অনেক কিছু অর্জন করতে পারতাম। সংগীতপ্রেমীরা আরও কিছু আবেগপ্রবণ গান পেতেন।

**সাবু :** তার সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ হয় না?

**মতিউর :** সর্বশেষ ২৩ মে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হয়। কুমিল্লায় একটি গোপন প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রথমে একজন জানে আলম ভাইকে ফোন ধরিয়ে দেয়। পরে আমার সঙ্গে পরদেশীর সামান্য কথা হয়।

এরপর আবার কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও আর বলেনি। সত্য কথা বলতে কি, পালিয়ে থাকা ছাড়া ওর আর কোনো উপায় নেই।

ওকে আমার খুব দরকার। ইউটিউবের সঙ্গে আমি চুক্তি করছি। ইতিমধ্যেই জার্মানিতে আমরা কথা বলেছি। সেখানে মুজিব পরদেশীর গান থাকলে আর কিছু লাগে না। কিন্তু আদৌও ওকে পাব কি না, জানি না।

**সাবু :** তার মানে পরদেশীর প্রত্যাবর্তন এখনও প্রত্যাশা করেন?

**মতিউর :** শিল্পী জীবনের কোনো অবসর নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে গানের মানুষ। হয়ত ৩০ বছরের কণ্ঠ পাব না, কিন্তু ৭০ বছরের কণ্ঠ তো পাব। এই বেলারও তো শ্রোতা আছে। মান্না দে, ভুপেন হাজারিকা কি শেষ বেলা পর্যন্ত গান করে যায় নি?

তাকে দিয়ে আমার আর ব্যবসা করার দরকার নেই। তাকে আমরা এখন সম্মান করতে চাই। পরদেশী নিজে যদি ইউটিউবের জন্য লাইভ প্রোগ্রাম করতে পারে, তাহলে কোটি কোটি শ্রোতা যুগ যুগান্তরে তাকে হৃদয়ে ধরে রাখতে পারবে। এখনও ইউটিউবে আছে। তবে সেটা অবৈধভাবে। আমরা বৈধভাবে তাকে দেখতে চাই।

**সাবু :** পরদেশীর অভাব পূরণ করার চেষ্টা করেননি?

**মতিউর :** একজনের অভাব আরেকজন দিয়ে কখনোই পূরণ হবার নয়। পরদেশীকে হারিয়ে সংগীত ভুবনে খুব একাকিত্ব অনুভব করেছিলাম। এরই মধ্যে খুলনা থেকে একটি পরিবার ঢাকায় আসে। সেই পরিবারের একটি ছেলে পাটুয়াটুলিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। একেবারে হালকা-পাতলা গড়নের। হাতে একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা, 'মতি ছেলেটি ভালো গান করে। পারলে তুমি একটু সহযোগিতা করিও।' যে চিঠিটি পাঠিয়েছে, তা গুরুত্ব না দেয়ার কোনো কারণ নেই।

**সাবু :** কে পাঠিয়েছিলেন?

**মতিউর :** শিল্পী দিলরুবা খান। এ কারণেই আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হলো। ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, আমার বোন ভালো গান করে। একদিন বাসায় আসবেন। সে আপনাকে দেখতে চেয়েছে। আমিও কিছু কিছু গান করি। চৌধুরীপাড়ার বাসায় গেলাম। দু'জনের গানই শুনলাম। আমি তো তখন মনে মনে মুজিব পরদেশীর স্থলে নতুন একজন শিল্পী খুঁজছি। পেয়ে গেলাম। নাম ছিল সৈয়দ আশরাফ হোসেন। মুজিব পরদেশী তখন লন্ডনে।

আমার হাতে পড়ে ওর নাম হয়ে গেল আশরাফ উদাস। দিলরুবা খানের নামও আমি রাখি। প্রথম আবিষ্কার দিলরুবা খান, দ্বিতীয় আবিষ্কার পরদেশী। এরপর আশরাফ উদাস। আশরাফ উদাসের কণ্ঠ যেমন রোমান্টিক, তেমনি দুঃখে ভরা। আর পরদেশীর কণ্ঠ ছিল একবারে দুঃখের সাগর।

'গাছটি হলো সবুজ বন্ধু, ফুলটি হলো লাল, তোমার আমার ভালোবাসা থাকবে চিরকাল' গানের প্রথম অ্যালবাম আশরাফ উদাসের। খুবই রোমান্টিক। একই অ্যালবামে আরেক গান 'ভালোবাসার জ্বালা বন্ধু জানতাম না, জানলে আগে তোমার সাথে প্রেম করিতাম না' একবারে বিচ্ছেদে ভরা।

**সাবু :** আপনার হাতে পড়া সবারই নাম পরিবর্তন করে অ্যালবাম করেছেন। নাম পরিবর্তনের সার্থকতা কী?

**মতিউর :** গানের মতো নাম নিয়ে খেলা করতেও ভালো লাগে। বলতে পারেন বাণিজ্যিক কারণেই নামের এই কাটসাট। মুজিবুর রহমান মোল্লা। গানের জগতে এত বড় নাম চলে না। ছোট করে মুজিব পরদেশী করেছি। একইভাবে সৈয়দ আশরাফ হোসেন থেকে আশরাফ উদাস করেছি। নিজের নামই তো পরিবর্তন করেছি।

গান হিট হলেও অনেক সময় নাম হিট হয় না। নাম পরিবর্তন করার কারণেই আশরাফ উদাস ভক্তদের কাছে পরিচিত একটি নাম। গানের পাশাপাশি নামও হিট হয়েছে। এর আরও একটি ব্যাখ্যা তা হচ্ছে, পঙ্কজ উদাসের সঙ্গে মিল রেখেই আশরাফ উদাসের নামকরণ। গ্রামেগঞ্জে বাম্পার হিট করলেন আশরাফ উদাস।

'আর ডাকিস না কোকিলরে তুই কুহু কুহু করিয়া, তোর ডাকে প্রাণ রয় না ঘরে সদয় ওঠে জ্বলিয়া', 'গুণের ননদলো, তোর ভাই ক্যানে বৈদাশ হতে আইলো না' শিরোনামের গানগুলো গ্রাম বাংলা মাতিয়ে তুলল।

নব্বইয়ের শুরুর ঘটনা। আশরাফ ছাড়া গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠান অচল। আইসক্রিমওয়ালা সারাদিন আশরাফেই পড়ে থাকত। অন্য ক্যাসেট বাজানোর সময় তার নেই। গ্রামের নারীরাও আইসক্রিমওয়ালাকে অনুরোধ করে আশরাফ উদাসের গান শুনতে চাইত। আশরাফের রোমান্টিক আর ট্র্যাজেডিক সুরের ঢেউয়ে গ্রাম বাংলার সংগীতপ্রেমী মানুষদের দিল যেন খান খান হয়ে যাচ্ছে। পরদেশীর মতো গানের মার্কেট আশরাফ উদাসের একক দখলে চলে গেল। গানের একজন লেখক এবং একজন শিল্পীর সার্থকতা ঠিক এখানেই।

একটানা ২১টি অ্যালবাম করালাম। প্রতিটি অ্যালবাম-ই সুপারহিট। লাখ লাখ কপি বিক্রি হচ্ছে। ভাগ্যের মালিক আল্লাহ। মুজিব পরদেশী দেশে ছিল না বলেই আশরাফ উদাসের কপাল খুলল। পরদেশী থাকলে আমি আমরাফ উদাসের দিকে ফিরেও তাকাতাম না।

আমি পরদেশীকে দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছি। সেই অভিজ্ঞতা আশরাফে প্রয়োগ করতে থাকলাম। তবে এ ক্ষেত্রে লিরিক (গীতিছন্দ) পরিবর্তন করতে শুরু করলাম।

লিখলাম, 'আমার লাইন হয়ে যায় আঁকা বাঁকা, ভালো না হাতের লেখা, আসও যদি বাঁশ বাগানে, আবার হবে দেখা', 'রুমালে লেখা ছিল বন্ধু, ভুইলো না আমায়', 'বইয়ের মধ্যে দিয়েছিলাম গোপনে প্রেমপত্র, আমি তখন হাইস্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র' ধাচের গানগুলো। চমৎকার

রোমান্টিক গান। মানুষের জীবনে প্রেম আসে নবম-দশম শ্রেণিতে পড়াকালে। কিশোর-কিশোরীরাই বেশি আবেগপ্রবণ হয়। তবে প্রেম তো সবার মধ্যেই থাকে। বিচ্ছেদের থাকে। আশরাফরে পাইয়া আমার লেখা রোমান্টিকতায় ভরে উঠল।

**সাবু :** পরদেশীতে ট্র্যাজেডি, আশরাফে রোমান্টিক?

**মতিউর :** লেখার জগতে প্রেম-বিচ্ছেদের ঘটনা আমার জীবনে উল্টো ঘটছে। মানুষের জীবনে আগে প্রেম আসে, পরে বিচ্ছেদ। আর আমার সংগীত জীবনে বিচ্ছেদ আগে এসেছে, পরে প্রেম।

পরদেশীরে দিয়া গাওয়াইছি, 'আমি কেমন করে পত্র লিখিরে, গ্রাম পোস্ট অফিস নাই জানা, তোমায় আমি হইলাম অচেনা'। কড়া বিচ্ছেদ। এ গান শুনলেই প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। আর আশরাফরে দিয়ে গাওয়াইলাম, 'পুকুরেতে পানি নাই পাতা তবু ভাসে, যার সনে যার দেখা নাই সে কেন হাসে রে'। প্রেম জাগিয়ে তোলার গান। ছন্দে ছন্দে রোমান্স। এ গান শুনে সবাই যেন প্রেম বনে যেতে চাইছে। একেবারে জীবনকে স্পর্শ করে গানগুলো লিখতে থাকলাম।

আমার লেখা একটি গান গেয়েই শিল্পী ঝুমু খান হিট। মাইল ব্যান্ডের মানাম ভাইয়ের সুরে গানটি ছিল, 'পান খাইতে চুন লাগে, ভালোবাসতে গুণ লাগে, কি করে যে তোমাকে বুঝাই'। পাঞ্জাবি গানের ধাচে সুর করা। আশরাফ উদাস এবং মমতাজকে দিয়ে গাওয়ানো বাছাই করা ৩০০ গান নিয়ে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে আমি দাবি করতেই পারি বাংলা লোকসংগীতে সামান্য হলেও আমি অবদান রাখতে পেরেছি। গানের বৈচিত্র্য, শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তু সব মিলে মূল্যায়ন করতে হয়। টাকা দিয়ে গান কিনে মানুষ শুনছে। অনেকেই তো গান লেখেন। কয়টি মার্কেট পায়?

**সাবু :** আশরাফ উদাসেরও তো ভাগ্য খুলে গেল? এখন কেমন আছে সে?

**মতিউর :** টানা দেড় যুগের সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আশরাফ উদাস। বলা যায়, তখন একমাত্র দাপুটে শিল্পী। গ্রামে কোটি কোটি শ্রোতা তৈরি হলো আশরাফের। এককভাবে টানা ২০টি অ্যালবাম করেছে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে।

আর্থিকভাবেও অনেক ভালো করেছে। এখন নানা প্রোগ্রামে যায়। তার সঙ্গে এখনও আমার মধুর সম্পর্ক। মাঝে মাঝেই দেখা হয়।

**সাবু :** এখন তো তাদের নিয়ে কাজ করছেন না?

**মতিউর :** সবাইকে নিয়ে আর কাজ করা হয় না। এখন একটু তরুণদের নিয়ে কাজ করছি। সালমা, বিউটিদের মতো শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

**সাবু :** আপনার আবিষ্কার প্রথম শিল্পী দিলরুবা খানকেও হারিয়ে ফেলছেন? এখন কেমন আছেন তিনি?

**মতিউর :** দিলরুবা খানকে হারিয়েছি, আমি ঠিক সেভাবে বলব না। সময়ের বাস্তবতা বড় কঠিন। আমার সঙ্গে তার এখনও যোগাযোগ আছে। আমরা যারা গান নিয়ে কাজ করি, তারা একেক সময় একেকজনে ভর করতে হয়। নইলে শিল্পী তৈরি হবে ক্যামনে। নতুনত্ব আসবে কীভাবে? আশরাফ উদাসকে পাওয়ার পরও আমি দিলরুবা খানকে নিয়ে অ্যালবাম করিয়েছি। 'পাগল মন' অ্যালবামটি প্রথমে করে আশরাফ উদাস। অনেক দিন পরে দিলরুবা খানকে দিয়ে অ্যালবামটি করে ডন মিউজিক এবং এই অ্যালবামে আশরাফের চেয়ে দিলরুবা খানই অনেক ভালো করেছে। ব্যবসাও হয়েছে সফল।

এমন সময় রুনা লায়লাকে নিয়েও কাজ করার প্রস্তাব এলো। ১৯৯৫ সালের দিকে রুনা আপাকে দিয়ে 'সঙ্গীতা'র ব্যানারে দুটি অ্যালবাম করার অর্ডার পেলাম।

**সাবু :** আপনার 'চেনা সুর' রেখে সঙ্গীতার ব্যানারে কেন?

**মতিউর :** রুনা আপার সঙ্গে সঙ্গীতা চুক্তি করেছিল। সঙ্গীতা আমার বড় একটি ডিলার। মাসে লাখ লাখ টাকা আমি সঙ্গীতার মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি।

একদিন সঙ্গীতার মালিক সেলিম খান আমাকে নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে বললেন, মতি ভাই আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। সেলিম খান আমার থেকে অনেক ছোট কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তার কাছে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাকে আমি কোনোভাবেই না করতে পারব না।

সেলিম খান বলছে, রুনা ম্যাডামের সঙ্গে একটি অ্যালবাম করার চুক্তি হয়েছে। অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ, রুণা আপা যেসব গীতিকারের নাম বলবেন, তা আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো হবে না। ব্যবসা ফ্লপ মারতে পারে। আবার রুনা ম্যাডাম যার তার লেখা গান গাইবেন না। বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠিক তাই। রুনা আপার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা তখন কারও নেই। শেখ সাদী খান তখন মিউজিক ডিরেক্টর। রুনা আপা শেখ সাদীকে বলেছে, পাঁচজন গীতিকার দিয়ে দুটি করে মোট ১০টি গান লেখা হোক। সেলিম খান, তা চায়নি। সেলিম খান বলল, মতি ভাই আপনি রুনা ম্যাডামের জন্য গানগুলো লেখেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। প্রথমত, রুনা আপার জন্য যে গান লিখে মেধা এবং সময় ব্যয় করব, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে আশরাফ উদাসের জন্য গান লিখে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আয় করতে পারব।

রুনা আপার গান সিরিয়াসিলি লিখতে হবে। তার জন্য ৫০ হাজার টাকা হয়তো দেবে। আর ওই সময়ে গান লিখে আশরাফ উদাসকে দিয়ে টাকা আসবে কমপক্ষে ৩০ লাখ। তখন আমার ব্যবসা চাঙা। আশরাফের ৩ লাখ কপি চললেই আমি ৩০ লাখ টাকা পাব। ১০ লাখ, ২০ লাখ এমনিতেই চলছে।

সেলিম আবারও বলল, মতি ভাই টাকার দিকে তাকালে অ্যালবামটি করতে পারব না। অ্যালবামটি আমার করা দরকার।

তখন আমি শর্ত দিয়ে বললাম, এই অ্যালবামের অন্য কেউ গান লিখলে আমি লিখব না। আমি ১২টি গানের বাইরে আর একটি গানও লিখতে পারব না। আমার কোনো গান রুনা আপা রিজেক্ট করতে পারবে না।

আমি অখ্যাতদের বিখ্যাত করেছি। আর রুনা আপা তো এমনিতেই বিখ্যাত। তার খারাপ করার কোনো সুযোগ নেই। তখন শেখ সাদী খান রুনা আপাকে বললেন, আপা আপনি কোনো কথা বলবেন না। আমরা একটি ছেলেকে দিয়ে গান লেখাব। বলছে, কে? সাদী ভাই বলছে হাসান মতিউর। আমার সঙ্গে তখন রুনা আপার পরিচয় নেই। তখন রুনা আপা বলছে, সত্য সাহার ছবিতে তো আমি হাসান মতিউরের গান করেছি। তখন অনেকেই ভালো করছেন। রুনা আপার ভালো কাটছিল না। ১২টি গানই লিখলাম। অধিকাংশই হালকা গান লিখলাম। প্রথম গান ছিল, 'প্রেম পিরিতির দাম এখন আগের মতো নেই'। গানের অর্থ বোঝার পর রুনা আপা তো পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

**সাবু :** ওই অ্যালবামটির নাম কী ছিল?

**মতিউর :** অ্যালবামের নাম দিলাম 'অন্তরে প্রেম'। ওই অ্যালবামের আরেক বিখ্যাত গান ছিল 'রাঙ্গামাটির পাহাড়ে, দুপুর বেলায় আহারে, নাম ধরে কে বাঁশরী বাজায়।' আরেকটি ছিল,'আমার রসেরি দেওরা, বাড়ির কাছে প্রেমের নদী ডুব দিলা না'।

রুনা আপা কোমরে শাড়ি গুঁজে বলল, জীবনে অনেক গান করেছি, কিন্তু এমন মজা পাইনি। এবার বুঝলাম, আপনাদের ক্যাসেট ক্যামনে এত জনপ্রিয় হয়। আমি তো মতি ভাইয়ের গানে পাগল হয়ে গেলাম। সেলিম খান ঈদের বাজারে ছাড়লেন। জমজমাট ব্যবসা করলেন। সুপার-ডুপার হিট।

**সাবু :** পরের অ্যালবাম?

**মতিউর :** 'স্বপ্নের তুমি' ছিল রুনার দ্বিতীয় অ্যালবাম। এই অ্যালবামের গান ছিল 'পিরিতির বাজার এখন মন্দা, সকালের প্রেম ভেঙ্গে যায় হওয়ার আগে সন্ধ্যা।'

দুটি অ্যালবামের জন্য সেলিম খান আমাকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন। দুটি অ্যালবাম থেকে কয়েক লাখ টাকা আয় করেছে সেলিম খান। এরপর একদিন সেলিম খান আমাকে ডেকে বললেন, 'মতি ভাই, আপনার লেখা গানের অ্যালবাম থেকে আমি সফল হয়েছি। আপনার জন্য মটোরোলা ব্র্যান্ডের এই মোবাইল সেটটি এনেছি।' অনেক সুন্দর এবং দামি ছিল সেটি। 'সঙ্গীতা'য় রুনা আপার প্রথম ক্যাসেট ছিল। বেশির ভাগ ক্যাসেটিই রুনা আপার ইন্ডিয়া থেকে বের হতো।

**সাবু :** সাবিনা ইয়াসমিনকে পেয়েছিলেন?

**মতিউর :** রুনা আপার অ্যালবাম দুটি করার পর সাবিনা আপাকে দিয়েও দুটি অ্যালবাম করেছিলাম। সে দুটিও বেশ ভালো হয়েছিল। তবে রুনা আপাকে দিয়ে যেভাবে হালকা গান করানো গেছে, সাবিনা আপাকে দিয়ে সেই রকম করা যায় না। একটু ভারি গান লাগে সাবিনা আপার ক্ষেত্রে। সাবিনা আপার একটি অ্যালবামের বিখ্যাত গান ছিল 'আমার বন্ধু

দিয়াছেরে দুই নৌকাতে পাও'।

**সাবু :** আপনার প্রতিষ্ঠান থেকেই।

**মতিউর :** 'মনে মনে প্রেম' নামের অ্যালবামটি আমার 'চেনা সুর' থেকে করা। আরেকটি সংগীতার ব্যানারে। তবে সবই আমার লেখা গানে। সাবিনা আপা এবং রুনা আপার চারটি সফল একক অ্যালবাম করতে পেরে আমি নিজেও ধন্য হলাম। এই দুজন শিল্পীর সমমানের আর তো কেউ নেই। আর সংগীত জীবনের বড় অর্জন ছিল এটি।

**সাবু :** চাকরি ছেড়েছিলেন কবে?

**মতিউর :** ১৯৮৭ সালে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিই।

**সাবু :** চ্যালেঞ্জ ছিল না?

**মতিউর :** পরদেশীর ক্যাসেট ছেড়ে আমার বাম্পার ব্যবসা। প্রডাকশন করছি, মার্কেটের খবর নিচ্ছি, গান লিখছি, নতুন শিল্পীর কথা ভাবছি আবার চাকরিও করছি। অতি ব্যস্ত হয়ে গেলাম। দুটো আর একসঙ্গে চালানো গেল না। হয় ব্যাংক, না হয় গান। কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়। শেষ বেলায় ব্যাংকই ছেড়ে দিলাম।

**সাবু :** আপনার লেখা গানকে কোন ধরনের লোকসংগীত বলবেন?

**মতিউর :** আমার গান ফোক (লোকসংগীত), তবে অনেকটাই প্রেম-বিচ্ছেদ। আবার একেবারে ভারি বিচ্ছেদও বলা ঠিক হবে না। অতি সহজেই জীবনকে স্পর্শ করাই হচ্ছে আমার গানের সার্থকতা।

**সাবু :** বিজয় সরকার বা শাহ আব্দুল করিমের বিচ্ছেদ গান থেকে আপনার গানকে কীভাবে আলাদা করবেন ?

**মতিউর :** বিজয় সরকার এবং শাহ আব্দুল করিম বাণিজ্যিক চিন্তা থেকে কখনও গান লেখেননি, এমনকি গানও করেননি। আমাকে যদি কেউ বলে যে, আপনি আমাকে একটি গান লিখে দেন, যে গানটি আমি বিক্রি করব না। কিন্তু আপনাকে ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হবে। আমি তার জন্য ভারি বিচ্ছেদ লিখে দেব।

ওই গানটি মানুষ রেডিও টেলিভিশনে শুনবে পয়সা ছাড়া। কিন্তু টাকা দিয়ে সিডি বা ক্যাসেট কিনে খুব কম লোক শুনবে।

বিজয় সরকার, শাহ আব্দুল করিম গান লিখে পারিশ্রমিক পাননি। সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু জীবনের আরও অর্থ আছে। জীবনের সংজ্ঞা হচ্ছে, খ্যাতি এবং অর্থ দুইয়ের সমন্বয়। অনেকেই ভালো গান লেখেন কিন্তু বাজারে ক্যাসেট চলে না। তাকে আপনি সফল বলতে পারেন না। তার সৃজনশীলতাকে আমি মূল্যায়ন করি। কিন্তু তার স্ত্রী-সন্তান না খেয়ে থাকবে, সেটাও কাম্য হতে পারে না।

**সাবু :** কিন্তু অর্থের পেছনে ছুটতে গেলে স্বকীয়তা হারানোর ভয় থাকে কি না?

**মতিউর :** অর্থের পেছনে ছুটে বেড়ানো এক বিষয়, আর সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে অর্থকে নিজের পেছনে ঘুরানো আরেক বিষয়। আমি আমার উৎপাদিত পণ্য দিয়ে অর্থ আয় করব, এখানে দোষের কী? এটি তো আলু-পটেলের ব্যবসা নয়।

আমি অনেক ভালো জুতা তৈরি করলাম, কিন্তু মানুষ তা কিনছে না। আমি তাকে সৃজনশীল কাজ বলতে পারি না। মানুষ অনেক সময় অর্থ ব্যয় করে শখের বসে ওই জুতাটি ক্রয় করলেই কেবল উৎপাদনের সার্থকতা। আমি গান লিখে ক্যাসেট করলাম, আর মানুষ যদি তা না কেনে তাহলে সেই গান বা ক্যাসেটের কোনো মূল্য নেই।

'যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই' আমার লেখা গান। আওয়ামী লীগের লাখ লাখ সমর্থক এই গানটি টাকা দিয়ে ডাউনলোড করে মোবাইলে রিংটন করেছে। সংগঠনের প্রতি অনুষ্ঠানে বাজছে। এই গানটি বিশেষ একটি কমিউনিটির মানুষকে বিশেষভাকে নাড়া দিচ্ছে। একজন স্রষ্টা তো এখানেই সুখী।

'একটি বোরকা পরা মেয়ে পাগল করেছে' একটি হালকা গান। এখানে আমি একজন প্রেমিকের আকুতি প্রকাশ করেছি। বোরকা পরা মেয়ে মুখ ঢেকে বাইরে আসে। কিন্তু প্রমিক খুঁজে পাচ্ছে না। না পেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে। আমি তো প্রেমিকের মন ছুঁতে পারছি। কেউ যদি টাকা দিয়ে সেই গান শোনে, তাহলে তো গানের মূল্য কমে না, বরং বাড়ে।

**সাবু :** বলতে চাইছি, এসব হালকা ফোক গান শুনে ভারি গানের শ্রোতা হারাল কি না?

**মতিউর :** আমরা বাইরের সংস্কৃতি থেকে বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করার আন্দোলন করেছি। আমরা যদি আশির দশকে ওই কৌশল না নিতাম, তাহলে ভারতীয় গানে বাজার আরও ভরে যেত। আমরা নিজস্ব ঢংয়ে গান লিখে বাংলা গানের ব্যাপকভিত্তিক শ্রোতা তৈরি করলাম এবং বাজার ধরে রাখার চেষ্টা করলাম।

আমাদের এই আন্দোলনে শিল্পী মমতাজরা যোগদান করে নব্বইয়ের দশকে। এখানে মমতাজের বড় অবদান আছে বলে আমি মনে করি। কারণ সারাদেশে মমতাজ বিশাল এক গোষ্ঠীকে নিজস্ব শ্রোতা বানালেন। মিল্টন খন্দকার আধুনিক গান লিখে গানকে বাণিজ্যিক ধারায় নিয়ে এসেছেন। আমি লোকসংগীতে। এই আন্দোলনে অন্যরাও যোগ দিয়েছেন। বলা যায়, সকলের যুগপৎ আন্দোলনের কারণে বাংলা ফোক গান গণমানুষের হয়ে উঠল।

এই ধাচের শ্রোতা এবং শিল্পী তৈরি হয়েছে বলেই ড্রয়িংরুমে বা প্রাইভেটকারেও আজ ফোক গান গুরুত্ব পাচ্ছে। নইলে হিন্দি বা উর্দু গানেই মানুষের মন পড়ে থাকত।

**সাবু :** আপনার গানে মমতাজ গ্রামবাংলা মাতিয়ে দিয়েছে। কবে, কেথায় পেলেন এই লোকসংগীত কন্যাকে?

**মতিউর :** '৯২, '৯৩, '৯৪ সাল বাংলাদেশে অডিও ইন্ডাস্ট্রির যৌবনকাল। ক্যাসেট ছাড়া আর কোনো কিছুতে মানুষ গান শুনছে না। গ্রামোফোনের দিন তো অনেক আগেই শেষ। আশির দশকের মাঝামাঝিতে ডিস্ক রেকর্ডারেরও দিন চলে গেল। ক্যাসেটেই বাজিমাৎ। এরই মধ্যেই মমতাজের উত্থান।

গ্রামেগঞ্জে আসর বা বৈঠকে বসলে মমতাজের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা ওঠে। অনেকেই বলে, মতি ভাই, মমতার গান করো না। ও তখনও মমতা। ছোট মানুষ। আমি বলি মমতা ক্যাডা? বলে, হায় হায় কয় কী ? মমতারে চেনে না? তুমি কারে নিয়া গান করো?

মমতাজ তখন রশিদ সরকারদের সঙ্গে সারাদেশে পালাগানে ব্যস্ত। শরিয়ত-মারফত, নারী-পুরুষ, জীব-স্রষ্টার পালা মানেই মমতাজ। পালা শিল্পী হিসেবে গ্রামেগঞ্জে এক নামে পরিচিতি পাচ্ছে। বিচ্ছেদ, মুর্শিদী গানও অস্থির করছে ভক্তদের।

এরই মধ্যে একদিন আমি সুলতান মাহমুদ বাবুল সাহেবের সাউন্ডটেকে যাই। নয়াবাজারে অফিস। সেখানে দেখি বাবুল সাহেব দুইজনের সঙ্গে কথা বলছেন। এর মধ্যে একজন মেয়ে। বাবুল ভাই আমারে জিজ্ঞাস করল, মতি ভাই কেমন আছেন?

তখন মমতাজ বাবুল ভাইরে জিগায়, মতি ভাই ক্যাডা? হাসান মতিউর নাকি? তখনও আমি মমতাজকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। মমতাজ আমারে পেয়ে অস্থির। বলছে, গুরু আপনারে দেখার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি। আমি কইলাম, তোমার জন্য তো আমিও পাগল। খুঁজতে খুঁজতে অস্থির।

এরপর একটি ক্যাসেট করার বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে গ্রামের ঠিকানা দিলো মমতাজ। রজ্জব আলী দেওয়ানের ছেলে বেহালা বাদক আলমাসকে সঙ্গে নিয়ে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে মমতাজের স্বামী রশিদ সরকারের বাড়ি গেলাম। ব্যাপক সম্মান করল আমাদের।

তারিখ ঠিক না করে গান দিয়ে আসলাম 'আমার জাত গেলো, পিরিতে পাড়া দিয়া সোনা বন্ধুয়ারে।' মমতাজের গলায় আমার লেখা প্রথম গান। ওর গলা হচ্ছে বিচ্ছেদের। পালা আর আধ্যাত্মিক নিয়েই ব্যস্ত। তখনও এমন রোমান্টিক গান সে করেনি।

আমার লেখা গান করবে এই ভেবে রাতে ঘুমায়নি মমতাজ। আমি তখন রুনা লায়লা, সাবিনা, ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোর, আশরাফ উদাসরে নিয়ে ব্যস্ত। আর মমতাজ ব্যস্ত মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান, রশিদ সরকারের গানে। মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান আর আমার গান এক বিষয় নয়। আমি তো রীতিমতো রোমান্টিকে। মাতাল রাজ্জাক দেওয়ানের গান অনেক উন্নতমানের। কিন্তু আমার ধরণটা সম্পূর্ণ আলাদা।

যা-ই হোক, নির্ধারিত তারিখে স্টুডিওতে চলে এলো। 'জাত গেল পিরিতে পাড়া দিয়া' গান তুলে দিলাম। শুইনা মমতাজ দেওয়ানা হয়ে গেল। বিচ্ছেদ গলায় চটুল গান। কি অসাধারণ যে গাইল। ওরে নিয়া আমার প্রথম অ্যালবাম। স্বরলিপি স্টুডিওতে রেকর্ড। সেই হোসেন আলী রেকর্ডিস্ট। স্বরলিপি এবং ঝংকারের ম্যানুয়াল রেকর্ডিস্ট সে। বাংলাদেশে সেরা শিল্পীদের গান রেকর্ডে তার তুলনা নেই। অল্প বয়সেই মারা গেছেন।

**সাবু :** মমতাজ আপনাতে মজে গেল?

**মতিউর :** একটানা ২৩টি অ্যালবাম করেছি মমতাজকে দিয়ে। এর মধ্যে

আর কারও কাজেই আমি হাত দেইনি। বাদ পড়ল আশরাফ উদাসও। শুধু এন্ড্রু কিশোরের চারটি এবং আসিফের দুটি অ্যালবাম করার সুযোগ পাই।

**সাবু :** আপনার বিচারে অন্যদের তুলনা করে মমতাজকে নিয়ে কী বলবেন? অথবা মমতাজে কতটুকু সুখ পেলেন?

**মতিউর :** রুনা আপা, সাবিনা আপা বা এন্ড্রু কিশোরদের সামনে আমি কাউকে দাঁড় করাতে চাই না। তারা অনেক বড় মানের শিল্পী। তাদের সবাই শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু আমার অর্জন যাদের নিয়ে তাদের ধরেই মূল্যায়ন করতে হয়। রুনা লায়লা-হাসান মতিউর জুটি পরিচিত নয়। পরিচিতি জুটি দিলরুবা খান-হাসান মতিউর, মুজিব পরদেশী-হাসান মতিউর, আশরাফ উদাস- হাসান মতিউর, মমতাজ-হাসান মতিউর। রুনা আপাদের সঙ্গে অনেক গীতিকার আছেন। রুনা আপারা বেতার, টেলিভিশন, ফিল্মের শিল্পী। মমতাজ মাটির শিল্পী। সে মাটিতে বসে গায়, দর্শকরা মাটিতে বসেই শোনে।

আমি যাদের তুলে এনেছি তারা গ্রামের ক্যাসেটের শিল্পী। একেবারে গ্রামের খাঁটি শিল্পী তারা। তবে সবার গানই করার অভিজ্ঞতা আছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে বলি, রুনা আপা থেকে নীলা পাগলী পর্যন্ত আমার বিস্তার। আইয়ুব বাচ্চু, পান্থ কানাই, পথিক নবীর গানও করেছি।

কিন্তু যাদের নামের সঙ্গে আমার নাম একেবারে মাখামাখি তারাই হচ্ছে মমতাজ।

**সাবু :** বলা হয়, মমতাজের সুর, শারীরিক ভাষায় নিজস্বতা আছে, যা অনেকের মধ্যেই নেই। আর এ কারণেই শিল্পী মমতাজ আজ ফোক সম্রাজ্ঞী। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেছেন?

**মতিউর :** অল্প কথায় মমতাজকে মূল্যায়ন করতে হলে বলব, মমতাজ হচ্ছে মধুর চাক। আর সেই চাকে সব মধুকর অর্থাৎ মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান, আব্দুর রশিদ সরকার, শাহ আলম, সালাম, আলাউদ্দিন আলী, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, হাসান মতিউররা মধু আহরণ করে সঞ্চয় করে রেখেছি। লালন সাঁইজি, বিজয় সরকার, শাহ আব্দুল করিম, মোনমোহন, রাধা রমণের মতো গুণী সাধকরাও মমতাজে ভর করেছে। মমতাজেই তাদেও গান পূর্ণতা পেয়েছে। এই মৌমাছিদের মধু ধারণ করেই আজ 'মমতাজ নামের মধুর চাক'।

এত গুণী সাধকদের চিন্তার ফসল একযোগে আর কেউ ধারণ করতে পারেনি। মমতাজকে বিশেষ ভাণ্ডার করে তৈরি করেছেন আল্লাহ। একটি কলসিতে অতিরিক্ত পানি রাখলে উপচে পড়ে। কিন্তু 'মমতাজ নামের ভাণ্ডারটি' অসীম, যা দিবেন তা-ই ধারণ করবে, লালন করবে। আর লালন করে তা কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, সে ব্যাপারে তার চেয়ে বুদ্ধিমতী আর কাউকে পাইনি। মমতাজের তুলনা মমতাজই।

**সাবু :** আপনার লেখায় মমতাজের কোন অ্যালবামটি বেশি মার্কেট পেয়েছে?

**মতিউর :** আলাদা করে বলা যায় না। তাকে নিয়ে করা প্রতিটি অ্যালবামই মার্কেট পেয়েছে। এর মধ্যে ১০ থেকে ১২ অ্যালবাম ছিল সুপারহিট, যেখান থেকে আমি লাখ লাখ টাকা আয় করেছি।

**সাবু :** মমতাজের কণ্ঠে বিশেষ কোনো গান...

**মতিউর :** মমতাজকে দিয়ে করানো চার নম্বর অ্যালবামটি 'আসল বৈঠকী'। ব্যাপক আকারে মার্কেট পায়। এটি ছিল মুর্শিদী গানের অ্যালবাম। আমার এলাকার পীর সানাল চাঁনকে নিয়ে দরবারি গানের অ্যালবামটি করি।

সেই অ্যালবামের গান 'ওরে আমার সানালরে, ওরে আমার দয়ালরে, আমি কি দিয়া ভোজিবরে তোমারে'। মারা যাওয়ার চারশ বছর পর সানাল চাঁনকে নিয়ে আমি এবং মমতাজ প্রথম গান করি।

মারফতি জগতের মানুষের কাছে গানটি অন্যরকম সাড়া ফেলল। কয়েক লাখ কপি বিক্রি হলো। এরপর রোমান্টিক গানের অ্যালবাম 'নয়ন তারা' 'বাল্যবন্ধু' আরও বাজার পেল। একসঙ্গে প্রতিটি অ্যালবাম হিট হওয়া আমার জন্য ছিল পরম পাওয়া। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো গীতিকারই এমন সফল ব্যবসা করতে পারেনি।

**সাবু :** মমতাজের জন্য কতগুলো গান লিখলেন?

**হাসান** মতিউর : ওর জন্য ৩শর অধিক গান লিখেছি।

**সাবু :** এখন লিখছেন না?

**মতিউর :** হ্যাঁ, এখনও আমি মমতাজকে নিয়ে কাজ করছি। কোনো করপোরেট হাউসের জন্য বা বিজ্ঞপনের জন্য গান লিখতে হয়। সমুদ্র বিজয়, স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তাবায়নের পর মমতাজ যে দুটি গান গায়, তা-ও আমার লেখা। বৃক্ষরোপণ, মাছ চাষ নিয়ে গানও লেখা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভাতের পরিবের্ত আলু খাওয়ার গান নিয়ে মমতাজের গাওয়া গানটিও আমার।

**সাবু :** এই গানের প্রেক্ষপট নিয়ে যদি বলতেন?

**মতিউর :** গানটির ব্যাপারে সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলা হয়েছে গানটি মমতাজ গাইবে এবং লিখবে হাসান মতিউর রহমান। সেনাপ্রধানের পছন্দের শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু। তাকে দিয়ে সুর দিতে চাইছেন।

একদিন সেনাবাহিনীর দপ্তরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ এবং আরও চারজন ব্রিগেডিয়ার মিটিংয়ে বসা। আমি বললাম, পয়েন্টগুলো ফাইন্ড করে দিন। আমি লিখে দেব। পরে আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে বসলাম।

আইয়ুব বাচ্চু বলছে, মতি ভাই মমতাজের গানে আমি কীভাবে সুর করব? আমি বললাম, আপনি চুপ করে বসে থাকেন। আপনাকে সুর করতে দিলে তো। আপনি শুধু কম্পোজিশনটুকু করে দিবেন। এ গানের সুর আমিই করব।

মমতাজকে নিয়ে এলাম আইয়ুব বাচ্চুর স্টুডিওতে। সেনাবাহিনীর গাড়িতেই। গান রেকর্ড হলো। পরের দিন ডিস্ক নিয়ে গেলাম। গান শুনে সবাই খুশি হলো। চ্যানেলগুলোতে টানা প্রচার হতে থাকল।

**সাবু :** মনির খানকে নিয়েও গান করলেন? কেমন ছিল এই আধুনিক শিল্পীর গান?

**মতিউর :** মনির খানও প্রথম আমার গানেই মাইকের সামনে দাঁড়ায়। ড্রিমল্যান্ড এর সংগীত পরিচালনায় আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে ছেড়েছিলাম 'রানরেট' নামের অ্যালবামটি। একক গানের ছিল। ব্যান্ড ধাঁচের। দেখলাম ভালো চলছে না। এরপর মিল্টন খন্দকার বের করলেন, 'তোমার কোনো দোষ নেই'। পরে আমি করলাম 'ভুলে গেছ দুঃখ নেই' অ্যালবামটি। ব্যাপক বাজার পেল।

ওর নাম ছিল মনির হোসেন। পরিবর্তন করে আমিই রাখি মনির খান। নামের গুণেই পার।

**সাবু :** অর্জনের কথা বললেন। গানের ভুবনে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, যা আপনাকে এখনও কষ্ট দেয়?

**মতিউর :** সবার কাছ থেকে সমান প্রত্যাশা করা যায় না। সমাজে যার বেশি উপকার করা হয়, সেই বেশি কষ্ট দেয়। মনির খানকে নিয়ে আমার জীবনেও তা-ই ঘটেছে। আমিই তার জীবনের প্রথম ১২টি গানের অ্যালবাম করি এবং শেষ অ্যালবামেও ১২টি গান লিখেছিলাম। আমার টাকায় তার প্রথম গান। আমার গানেই প্রথম মাইক্রোফোনে ফুঁ দেয়া।

কিন্তু কোনো কারণে তার কাছ থেকে এমন কষ্ট পেয়েছি, যা জীবনে ভোলার নয়। আমার সঙ্গে তার এখনও ভালো সম্পর্ক। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি, তাকে দিয়ে জীবনে কখনও গান করাব না।

**সাবু :** গানের ভুবনে দীর্ঘ সময়ে পথ চলায় নিজের মননের পরিবর্তনও তো হলো?

**মতিউর :** পরিবর্তন অনেক হয়েছে বটে। কিন্তু সেই পরিবর্তনে আমাদের তাল মেলাতে নেই। আমরা যারা ফরমায়েশে গান লিখি, তাদের মননের পরিবর্তন হলে চলে না। যারা গান লেখেন তাদের আশি বছর বয়সী বৃদ্ধের আবেগকে যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমানি ২২ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীকেও গুরুত্ব দিতে হয়। ২২ বছরের ছেলে একটি মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ৬০ বছরের একজন বৃদ্ধ এ কাজ করতে পারেন না। না করতে পারাটা হচ্ছে বাস্তবতা।

প্রেম আর আবেগ এক বিষয় নয়। প্রেম শাশ্বত। আবেগ ক্ষণস্থায়ী। প্রেম সবার মধ্যেই বিরাজ করে। আবেগ তা করে না। আমরার যারা প্রেমের গান লিখি, তাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করেই লিখতে হয়।

এখন অবশ্য গান লিখতে গিয়ে অনেক ভাবতে হয়। ভাবনা সহজও হয়ে গেছে, নানা অভিজ্ঞতার কারণে। যা-ই লিখি, যাদের জন্যই লিখি, গানে যেন কোনো না কোনো একটা মেসেজ থাকে।

গানের কেন্দ্রে যেন মানুষ থাকে। মানুষের বিবেক থাকে।

**সাবু :** সব গান-ই ফরমায়েশে লিখলেন?

**মতিউর :** না। সব গানই ফরমায়েশে লিখিনি। তবে আমি যা লিখিছি, তার একটি গানও ডায়রির পাতায় আটকে থাকেনি। প্রতিটি গানই রেকর্ড

হয়েছে। এমন গান লিখিনি যা রেকর্ড করার মতো না বা মানুষ শুনতে চাইবে না। যা লিখিছি তা-ই কারও না কারও কণ্ঠে উঠেছে। এখনও শত শত গানের অর্ডার রয়েছে। সময় পাচ্ছি না। মন চাইলে আবার আমার মতো করে লিখব। সেটা আমার ভালো লাগা থেকে। কোনো একদিন অন্য কারও গলায় তুলে দেব।

গান লিখি তার জন্য, যার মন আছে। বাজে লোক কখনও গান শুনতে পারে না। জোর করেও আপনি তাকে গান শোনাতে পারবেন না। আবার দেখবেন, কেউ কেউ বাজারের টাকা বাঁচিয়ে ক্যাসেট কিনছে। পরিণত বয়সে বিষয়টি এখন গুরুত্ব দিতে হয়, গুরুত্ব দিয়েই লিখতে হয়। যাকে বলে, গানের মানুষের জন্য গান লেখা।

**সাবু :** এই আবেগ আপনার ভালোবাসার মানুষটি কতটুকু ধারণ করলেন?

**মতিউর :** গানের জগতে আমার স্ত্রী একেবারে আনাড়ী। গান নিয়ে তার কোনো ধারণা নেই।

তবে সে আমার এই জগত নিয়ে কখনও বিরক্তবোধ করেননি। এর কারণ হচ্ছে, আমি গানের ভুবনে থাকলেও পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেয়ার চেষ্টা করেছি। এই জগতে এসে অনেকেই সংসার ধর্ম থেকে হারিয়ে যায়, নেশার ঘোরে হাবুডুবু খায়। আমার জীবনে তা ঘটেনি। এ কারণেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের ৩৬ বছরে কোনো দ্বন্দ্ব বা কলহ সৃষ্টি হয়নি। সে থেকেছে সংসার নিয়ে, আর আমি থেকেছি গান নিয়ে। গান দিয়েই তো সংসার সাজিয়েছি।

**সাবু :** ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে কী বলবেন?

**মতিউর :** এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে পিয়াস। ও বাংলাদেশ মেডিকেল থেকে এমবিবিএস করেছে। এখন মনোয়ারা হসপিটালে প্রাকটিস করছে। উচ্চ শিক্ষা নিতে দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ছেলেকে বিয়ে দিয়েছি। এরই মধ্যে ওর ঘরে ফুলের মতো একটি মেয়ে এসেছে। নাম দিয়েছি কুটুম।

এরপরের মেয়ে নাহিদা আক্তার নূপুর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শেষ করেছে। বিয়ে দিয়েছি। একটি মেয়ে, নাম দৃষ্টি। সবার ছোট মেয়ে নাফিয়া আক্তার মাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারিজ বিভাগে পড়াশোনা করছেন। ঢাবি উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীই বিভাগটি পছন্দ করে দেন।

**সাবু :** আপনি গানেই থাকছেন। সন্তানেরা উচ্চশিক্ষিত। তাহলে সন্তানের এমন শিক্ষার জন্য মায়ের অবদানকেই বড় করা দেখা যায়?

**মতিউর :** তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার স্ত্রী রীতিমতো সাংসারিক এবং সন্তানের প্রতি যত্নশীল। আমার গানের পয়সায় সংসার চললেও ও আমার গানের ধার ধারেনি। কোনো একটি গান মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না, সন্দেহ আছে।

ছেলেমেয়েদের পড়লেখার পেছনে আমার স্ত্রীর একক কৃতিত্ব বলে মনে করি। ওমন মা না পেলে সন্তানেরা এভাবে মানুষ হতো না।

আমি একাধারে বাংলাদেশ ক্যাসেট ব্যবসায়ী সমিতির টানা ২০ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাকে এই অবস্থায় আসতে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। চাকরি করেছি, গান লিখিছি, শিল্পী খুঁজেছি, রেকর্ড করে তা আবার বাজারে ছেড়েছি। এখানও রীতিমতো প্রতিযোগিতা রয়েছে। একটু দুর্বল হলেই চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে। টিকে আছি মেধা এবং কঠোর পরিশ্রম করেই। এ কারণেই সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে পারিনি।

**সাবু :** এমন ব্যস্ততায় সামাজিকতা রক্ষা হয়?

**মতিউর :** আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। বিয়ে, খাৎনাসহ প্রতি অনুষ্ঠান যাই। মানুষের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে। মানুষে মিশলে তার হাসি-কান্না,আনন্দ-বেদনা স্পর্শ করা যায়।

এরপরও অনেক সময় মানুষের কথা রাখতে পারি না। মানুষ মনে করে, সচ্ছল হয়েছি তাই এড়িয়ে চলি। আসলে তা নয়। আমাদের ব্যস্ততা হচ্ছে অনির্ধারিত। এ কারণে গান সাধকদের সংসারের অনেক কিছু থেকেই দূরে থাকতে হয়।

**সাবু :** নিজে সাধনা করে চলছেন। এই সাধনায় ছেলেমেয়েরা এলো না?

**মতিউর :** ওদের ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। আমার স্ত্রী এবং ছেলে মিলেই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আমি মনেপ্রাণে চেয়েছি, ওরা উচ্চশিক্ষা নিয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। কারণ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যারা গানের মানুষ তারা সন্তানের প্রতি উদাসীন। কথা সত্যেও বটে। আমাদের যৌবনকালে নিজের দিকে তাকাই না। টাকা আসে, চলে যায়। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সমাজে অল্পবয়সী শিল্পীদের কণ্ঠে মানুষ গান শুনতে চায়। বয়স বেশি হলে তার আর দাম থাকে না।

কিন্তু যদি অল্প বয়সে আয় করা টাকা ঠিকমতো ধরে রাখতে পারত তাহলে বৃদ্ধ বয়সে তাকে চরম অভাবে পড়তে হয় না। বাউলরা এই চিন্তা করে না। অনেক বড় বড় শিল্পীকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখেছি। বয়সকালে একটু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেই মিডিয়ায় খবর চলে, অমুকের চিকিৎসার জন্য হাত বাড়ান। তখন দর্শক, শ্রোতা আমাদের ব্যাপারে নেতবিাচক ধারণা পোষণ করে। মনে করে এত বড় শিল্পী টাকা আয় করে কী করেছে? তখন আমাদের সম্মান ধুলায় মিশে যায়।

**সাবু :** ১ হাজার টাকা নিয়ে ঢাকায় এলেন। ফুটপাতে কাপড়ের ব্যবসাও করেছিলেন। এখন কেমন আছেন?

**মতিউর :** আল্লাহ অশেষ মেহেরবানিতে বেশ ভালো আছি। আমি যেখানে হাত দিয়েছি, সেখানেই সফল হয়েছি। ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গানের ব্যবসায় আসার পর পেছনের দিকে আর তাকাতে হয়নি। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছি।

মগবাজারে দুটি পাঁচতলা বাড়ি করেছি। পাঁচ কাঠা এবং আড়াই কাঠা জায়গা আছে। গীতিকার হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে পূর্বাচল সিটিতে আমাকে তিন কাঠা জায়গা দেয়া হয়েছে। এতে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি।

সবচেয়ে গর্বের বিষয় হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা, সম্মান। তা আমি যথেষ্ট পেয়েছি এবং পেয়ে যাচ্ছি। এই ভালোবাসা মূল্যায়ন করার ভাষা আমার জানা নেই।

এ কারণেই আমি আমার গানের জগতের মানুষকে বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান করছি, যারা গান লিখে, গেয়ে আয়রোজকার করে থাকেন, তারা যেন অকালে ঝরে না যায়। একটু নিজের দিকে নজর দেবেন। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ভালো গুণগুলো অনুসরণ করুন। মন্দগুলো ত্যাগ করুন। জীবনের নিরাপত্তার জন্য যা করার এখনই করুন।

**সাবু :** আপনার এই ভুবনে অনেককেই দেখলেন। গীতিকার, সুরাকার বা শিল্পীদের মধ্যে এমন কাউকে পেলেন, যিনি একেবারেই গানের মানুষ, যাকে অন্য কোনো সত্তা দিয়ে বিচার করা যায় না?

**মতিউর :** আমি নিজেকে বাউল বলে দাবি করি। কারণ বাউল, গান এবং সুর নিয়েই আমার গবেষণা। আমি রবি চৌধুরী বা এন্ড্রু কিশোরের গীতিকারের চাইতে মমতাজ বা আকলিমার মতো শিল্পীদের গীতিকার বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

আমার সময়ে বা আগে-পরে অনেককেই দেখলাম। ভালোও দেখলাম, মন্দও দেখলাম। এর মধ্যে কিছু কিছু মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে চলাফেরা করেন। আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত কারও কারও মধ্যে ভর করে।

এমনই একজন বাউল সাধক আককাস দেওয়ান। তিনি একাধারে বাউল গানের গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। একই কথা আমি লিখব, ভালো লাগবে না, কিন্তু আককাস দেওয়ান লিখলে ভালো লাগবে।

বিচ্ছেদ গানে আককাস দেওয়ানের কোনো বিকল্প নাই। আমি গ্রামে গেলে বাইরে থেকে শিল্পী নিয়ে যাই। শিল্পীদের জিগাই, তুমি আককাস দেওয়ানের গান জানো? যদি বলে জানি, তখন আমি আর অন্য কারও লেখা গান শুনি না। সারা রাত আককাস দেওয়ানের গান শুনেই পার করে দেয়ার রেকর্ড আছে।

**সাবু :** এরকম তো অনেকেই লিখছে?

**মতিউর :** না। এরকম অনেকেই লিখতে পারেনি। গান আমিও লিখিছি। এরপরও তার গানে আমার মন টানে।

খুব সহজে বলছি, বর্তমান সময়ে আমরা যারা গান লিখছি, তাদের থেকে আককাস দেওয়ানকে অনায়াসেই আলাদা করা যায়। সারা দেশে তার কোটি কোটি ভক্ত। সমস্ত ভক্ত একদিকে, আর আমি হাসান মতিউর একদিকে। তবুও আমার ভক্তির পাল্লা বড় হবে বলে মনে করি।

**সাবু :** বাবা ২০০২ সালে মারা গেলেন। মা থাকেন কোথায়?

মতিউর : মা গ্রামের বাড়িতেই থাকেন, ঢাকায় কোনোভাবেই মাকে রাখতে পারিনি। গ্রাম ছেড়ে আসা আর তার পক্ষে সম্ভব না। তিন ভাই সেখানে। ভাইদের কাছেই থাকছেন। মা বেশ ভালো আছেন।

**সাবু :** গ্রামে যাওয়া হয়?
**মতিউর :** মাসে অন্তত দু'বার যাই। দোহার তো এখানেই। মাত্র দুই ঘণ্টার রাস্তা। সকালে যাই সন্ধ্যায় চলে আসি।
১৯৭৫ সালে ঢাকায় এসেছি। আজ পর্যন্ত কোনো ঈদ ঢাকায় করিনি। বেঁচে থাকতে করব বলে মনেও করি না। গ্রামে সবার সঙ্গে মিলে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করি।
**সাবু :** জীবনে কোনো অতৃপ্তি বা হতাশা আছে?
**মতিউর :** না। আমি আশাবাদী এবং সাহসী মানুষ। আমি কর্মে বিশ্বাসী। আপনি অনেক বড় কাজ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে আমি একাই করে দেব। না পারলে আগেই মুক্তি নেব।
**সাবু :** মুর্শিদী গানও লিখলেন। ব্যক্তি জীবনে দয়াল, মুর্শিদকে কেমন পেলেন?
**মতিউর :** আল্লাহতে প্রবল বিশ্বাস রাখি। রাসুল আমার দিশারী। আমি শুনে মুসলমান না। দেখে, বুঝে আমি ধর্মে বিশ্বাস করি।
**সাবু :** গানের বাইরে অন্য কোনো শখ?
**মতিউর :** প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস আছে। আমি নীলক্ষেতে গেলে এখনও পুরাতন বই কিনি। অনেক লেখক, গীতিকার আছেন যাদের নামই আমরা জানি না। আমি চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের লেখকদের বই কিনে পড়ছি।
খেলা দেখার ভয়ঙ্কর অভ্যাস। আমি মোহামেডানের সমর্থক। আবহানীর খেলাও ভালো লাগে। এখন আমি ক্রিকেটপাগল মানুষ। ক্রিকেটের ওপর বই কিনে মুখস্থ করেছি। বাংলাদেশের বাইরে ক্রিকেটে ইন্ডিয়ার সমর্থক। শচীনের চরম ভক্ত আমি। ফুটবলে ইতালি আমার ফেবারিট দল। রিয়াল মাদ্রিদের জন্য পাগল।
**সাবু :** এ পর্যন্ত কতগুলো গান লিখলেন?
**মতিউর :** আমি সব গানই প্রয়োজনে লিখেছি। গান লেখার সঠিক হিসাবটি নেই। সব মিলে আড়াই থেকে তিন হাজার গান লেখা হয়েছে বলে আমার ধারণা। সবই রেকর্ড হয়েছে। রেডিওতে চারশ'র মতো গান আছে।
**সাবু :** ফিল্মের জন্য লিখেছিলেন?
**মতিউর :** আমি ৭২-এর অধিক সিনেমায় গান লিখেছি। পরে ছাড়তে হয়েছে। কারণ ফিল্মের অনেকেই গান বোঝে না। বিরক্ত লাগে। আমার লেখা গান কাটছাঁট করা পছন্দ করতাম না। সিনেমায় এটি হয়। এ কারণে একবারে না ঠেকলে সিনেমার জন্য গান লিখি না।
সর্বশেষ 'মাঝি' সিনেমায় আমি নিজেই সঙ্গীত পরিচালনা করছি। আমেরিকান এক প্রবাসী সিনেমাটি করছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা এটি। ৫টি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড হয়েছে। রুনা আপা, সাবিনা আপা, এন্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ এবং মুন গানগুলো করেছে। মাঝির গানটি গেয়েছে কিরণ চন্দ্র রায়।
**সাবু :** কিরণ চন্দ্র রায়কে দিয়ে আগে গান করানো হয়নি।
**মতিউর :** হ্যাঁ, করেছি। সে আমার একজন ফেবারিট শিল্পী। চন্দনা মজুমদারকে দিয়েও আমি বিজয় বিচ্ছেদ করেছি। কিরণদার বাড়িও আমার এলাকায়। একই সালে মেট্রিক পাস করেছি।
**সাবু :** কী গান করালেন কিরণ চন্দ্রকে দিয়ে?
**মতিউর :** আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজয়রে গানের খুব ভক্ত। বিজয়কে আমি সব সময় ধারণ করি। এই গান শুনলেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। বাংলাদেশে প্রথম বিজয়ের গান নিয়ে অ্যালবাম করি আমি দিলরুবা খানের কণ্ঠে।
ওই গানের দায়িত্ব দিয়েছিলাম নকুল কুমার বিশ্বাসকে। গানগুলো আমি বিজয়ের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম। যে অ্যালবামটি নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে।
১৯৮৫ সালের কথা। বিজয় বিচ্ছেদের অ্যালবামটি করার পর তার গ্রাম নড়াইল থেকে মানুষ এসে আমাকে এবং দিলরুবা খানকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। অ্যালবামের নামকরণ নিয়ে বিব্রত হলাম। অনেকেই মনে করল ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস নিয়ে করা। এই ঘোর কাটতে সময় লেগেছে।
বিজয়ের গানে পরের অ্যালবামটি করলাম কিরণ দাকে দিয়ে। আমাকে আর নতুন করে সংগ্রহ করতে হয়নি। কিরণ দা নিজেই বিক্ষিপ্তভাবে গাইতেন। আমি প্রস্তাব করলে কিরণ দা মহাখুশি হয়ে গাইলেন।
**সাবু :** তার মানে বিজয়ের গানে কিরণ চন্দ্রেই ভরসা পেলেন?

> সবচেয়ে গর্বের বিষয় হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা, সম্মান। তা আমি যথেষ্ট পেয়েছি এবং পেয়ে যাচ্ছি। এই ভালোবাসা মূল্যায়ন করার ভাষা আমার জানা নেই। এ কারণেই আমি আমার গানের জগতের মানুষকে বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান করছি, যারা গান লিখে, গেয়ে আয়রোজকার করে থাকেন, তারা যেন অকালে ঝরে না যায়। একটু নিজের দিকে নজর দেবেন। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ভালো গুণগুলো অনুসরণ করুন। মন্দগুলো ত্যাগ করুন। জীবনের নিরাপত্তার জন্য যা করার এখনই করুন

**মতিউর :** আল্লাহর অশেষ রহমত যে, আমি যার গান তাকে দিয়ে করাতে পেরেছি। বিজয়ের গান করতে গিয়ে আমাকে নম্বর ওয়ান শিল্পী খুঁজতে হয়েছে। এই বিবেচনায় কিরণ দার সমকক্ষ আর কোনো শিল্পী নাই। এখনও কিরণ দার চেয়ে বড় কোনো শিল্পী নাই, অন্তত বিজয়ের গানে। অমন দরাজ কণ্ঠে, লম্বা সুরে আর কেউ বিজয়ের সুর তুলতে পারে না। কিরণ দা শিক্ষিত এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানে শিক্ষিত। কিরণ দার কণ্ঠে বিজয়ের গান যখন বাজারে ছাড়লাম, তখন পুরা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা মেতে উঠল। সবাই যেন চিৎকার দিয়ে উঠল। কিরণ চন্দ্রের সেই অ্যালবামটি সুপার, ডুপার এবং বাম্পার মার্কেট পেল। গানের মান যেন ঠিক জায়গায় মূল্যায়িত হলো।
**সাবু :** আর কোথায় যেতে চান?
**মতিউর :** সংগীত জগতের বিশাল পটপরিবর্তন এসে গেছে। অনলাইন থেকে নামিয়ে আমি হেডফোনে শুনছি, কিন্তু আমার পাশের জন শুনছে না। এখন গান সব অন্তরালে। দৃশ্যমান কিছু নেই। আগে মাইকে গান বাজলে গোটা গ্রাম শুনত। এখন পাশের জনও শুনতে পায় না।
সিদ্ধান্ত নিয়েছি পুরাতন কিছু গান রিমিক্স করার। বাংলাদেশের মিউজিক এখন অনেক উন্নত মানের। কম্পোজিটররা অনেক শিক্ষিত। তাদের হাতে আমার গানটিও শিক্ষিত হয়ে উঠবে। যেমন হচ্ছে শাহ আব্দুল করিমের গান। '৭০-এর দশকে লেখা শাহ আব্দুল করিমের গান ২০১৫ তে এসে প্রাণ পাচ্ছে কম্পোজিশনের কারণে। আমার অন্তত ১ হাজার গান আছে যেগুলো আধুনিক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কম্পোজিশন করলে ফের সুপার হিট হবে।
আমার লেখা গান 'তুমি যে ক্ষতি করলা আমার, আল্লায় করবে তোমার বিচার' লিটন নামের এক শিল্পী গেয়েছিল অনেক আগে। তখন ও ভালো করেছিল। কিন্তু ক্লোজআপ ওয়ান তারকা রাজিব যখন গাইলো তখন গানটি আরও প্রাণ পেল। এটি সম্ভব হয়েছে কম্পোজিশনের কারণে। প্রযুক্তির বিকাশ মাথায় রেখেই এখন গান নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।